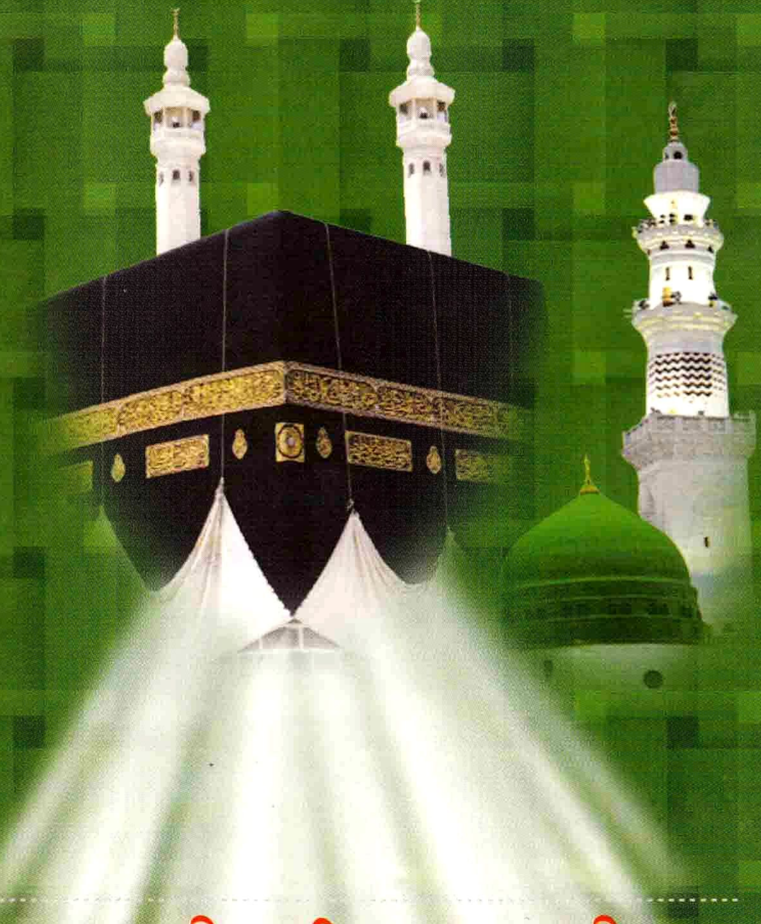
ইছবাতুন নুবূওত



মূল ঃ ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)

অনুবাদ ঃ ডঃ আ, ফ, ম, আবু বকর সিদ্দীক

অনুবাদক পরিচিতি

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক প্রফেসর ড. আ. ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ১৯৪২ সালে সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলাধীন আমতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুনশী মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স, ১৯৬৭ সালে এম. এ এবং ১৯৬৪ সালে ফরিদগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীছ) ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর "Shaikh Ahmed Sirhindi (Rh.) and his Reforms" শীর্ষক বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করে ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি মে, ১৯৬৮ থেকে মে, ১৯৬৯ পর্যন্ত সরকারী চিটাগাং কলেজে আরবী প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। সরকারী বি, এল কলেজ খুলনায় ২৬-০৫-৬৯ থেকে ৩০-০৫-৭৮ পর্যন্ত লেকচারার পদে কর্মরত ছিলেন। ০১-০৬-৭৮ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এখানে কর্মরত থাকার পর ৩০-০১-১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পর ১৯৮৯ সাল থেকে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা, স্যার এ. এফ. রহমান হলের হাউস টিউটর ও প্রভোস্ট (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক দীর্ঘদিন থেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। এ পর্যন্ত ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ ও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে : ১. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র); ২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব; ৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.); ৪. মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.)- জীবন ও কর্ম; ৫. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ৬. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ; ৭. মুকাশিফাতে আয়নিয়া; ৮. মা'আরিফে লাদুন্নিয়া; ৯. মাবদা ওয়া মা'আদ; ১০. ইছবাতুন নুবুওত; ১১. আবু দাউদ (১ম-৫ম খন্ড); ১২. রিসালায়ে তাহলীলিয়া; ১৩. স্মরণকালের মরণজয়ী; ১৪. আল-কুরআনের সরল তরজমা (অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.); ১৫. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.); ১৬. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.); ১৭. তাফসীরে মাযহারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.); ১৮. তাফসীরে তাবারী শরীফ ৩০তম পারা (অনুবাদক, ই. ফা. বা.); ১৯. সিরাতুন্নবী (স.)- ইবনে হিশাম ৪ খন্ডে সমাপ্ত (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.); ২০. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত ৪ খণ্ডে সমাপ্ত (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.); ২. আল-কুরআনের চ্যালেঞ্জ; ২২. রূহের সফর।

ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ ও ইসলামিক রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং একাডেমীর একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে যোগদান উপলক্ষে সউদী আরব, পাকিস্তান, ভারত ও ইরান সফর করেন। অধ্যাপনা, লেখালেখি ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি আত্মশুদ্ধিমূলক আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। মুজাদ্দেদিয়া কমপ্লেক্স নামক প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ ক'জন গবেষক এম. ফিল ও পি. এইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

ডঃ আ, ফ, ম আবু বকর সিদ্দীক বিগত ৩০-৬-০৮ সনে ৬৫ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর বিভাগের প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে ১৫-৯-০৮ ইং থেকে এ্যাড হক ভিত্তিতে সুপার নিউ মেরারী অধ্যাপক বা সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করেছেন।

পরিবেশনায়

মুজাদ্দেদীয়া কমপ্লেক্স

মিরপুর, ঢাকা।

ফোন ঃ ৮০৫১৯১৮

ইছবাতুন নুবূওত

মূল :

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)

অনুবাদ :

ড. আ,ফ,ম আবু বকর সিদ্দীক

প্রাপ্তি স্থান
মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা
প্রোঃ মোঃ ইব্রাহিম
বাইতুল মোকাররম, ঢাকা
[illegible]

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৮ বাং
শাবান ১৪১২ হি.
ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ : পৌষ ১৪১৭ বাং
মহররম ১৪৩২ হি.
জানুয়ারী ২০১১ ইং

প্রকাশনায় : গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দিদীয়া
প্লট # ১২৮, রোড নং # ৭
ব্লক # বি, সেকশন # ১২
মিরপুর, ঢাকা। ফোন : ৮০৫১৯১৮

মুদ্রণে : ঢাকা প্রিন্টার্স
শিরিস দাস লেন, ঢাকা-১১০০

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় : আল-আশরাফ কম্পিউটার্স
৪৫,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র

ITHBATUN NUBUWAT : Proof of Nubuwat, Written by **Shaikh Ahmad Sirhindi (Rh.)** Translated by **Dr. A.F.M. Abu Bakar Siddique** and Published by Khankai Khas Mujaddedia, Plot # 128, Road # 7, Block # B, Section # 12, Mirpur, Dhaka, Bangladesh, Phone : 8051918, January : 2011

Price Tk. 100.00; $ 3

উৎসর্গ :

ইছবাতুন নুবূওত গ্রন্থটি
শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.)-এর
রূহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হলো... ...

এই লেখক কর্তৃক অনূদিত ও লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ :

মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
মুকাশিফাতে আয়নীয়া
মাআ'রিফে লাদুন্নিয়া
মাব্‌দা ওয়া মা'আ'দ
বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)
আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ
স্মরণকালের মরণজয়ী
দীনে ইলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)
আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)

প্রাপ্তিস্থান

আন-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গাউছিয়া পাবলিকেশন্স
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	০৭
২।	মুকাদ্দামা	১৪
৩।	প্রথম অধ্যায় : ইছবাতুন নুবূওত	২১
৪।	নুবূওতের আসল অর্থ কি?	২৬
৫।	দ্বিতীয় অধ্যায় : মু'জিযা সম্পর্কে	৩০
৬।	দু'টি বক্তব্য : বিছাত ও নুবূওতের হাকীকত সম্পর্কে	৩৫
৭।	বি'ছাত অস্বীকারকারীদের কতিপয় অভিযোগ প্রসংগে	৩৯
৮।	বি'ছাত এবং শরীয়তের হিকমাত	৪২
৯।	তৃতীয় অধ্যায় : খাতিমুল আম্বিয়া (আ.)-এর নুবূওতের প্রমাণ	৫২
১০।	ইছবাতুন নুবূওতের বিভিন্ন পদ্ধতি	৫৭
১১।	আল-কোরআনের ই'জাযের প্রমাণ	৬০

ভূমিকা

হযরত ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে ছানী (রহ.)-এর দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান কিতাব, 'ইছবাতুন নুবূওত' বা নুবূওতের প্রমাণ, বাংলা ভাষায় প্রকাশ পেতে যাচ্ছে বিধায় আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে লাখো কোটি শোকর আদায় করছি। মুজাদ্দেদীয়া সিলসিলার অযোগ্য খাদিম হিসাবে মনের মধ্যে এরূপ বাসনা সৃষ্টি হয় যে, হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে-ছানী (রহ.)-এর লিখিত ও প্রকাশিত বইগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার চেষ্টা করবো। ১৯৮৩ইং সনে আমার থিসিসের তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য যখন ভারত ও পাকিস্তান সফর করি, তখন লাহোর ও করাচীতে অনেক মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধান পাই। বিশেষতঃ করাচীর ইদারায়ে মুজাদ্দেদীয়া, নাজিমাবাদ থেকে হযরত মুজাদ্দিদ (রাহ.)-এর অন্যান্য গ্রন্থ-মুকাশিফাতে আয়নীয়া, মাআ'রিফে লাদুন্নিয়া, মাব্‌দা ওয়া মাআ'দ ও মাকতুবাত শরীফ সংগ্রহ করি। সে সময়-ইছবাতুন নুবূওয়াহ্‌ ও রিসালায়ে তাহলীলিয়া গ্রন্থ দুটি ছাপানো না থাকার কারণে সংগ্রহে ব্যর্থ হই। দেশে ফিরে মুকাশিফাতে আয়নীয়া, মা'আরিফে লাদুন্নিয়া ও মাব্‌দা ওয়া মাআ'দের অনুবাদ কাজ সম্পন্ন করি, যা "সিরহিন্দ প্রকাশনী" থেকে প্রকাশিত হয়ে ইতিমধ্যে দিনের আলো দেখতে সক্ষম হয়েছে। 'ইছবাতুন নুবূওত' বইটি পাবার আশায় পরিচিত মহলের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রাখতে থাকি। অবশেষে, আল্লাহর অফুরন্ত রহমতে মৌলভী নিজামুদ্দীন সাহেবের প্রচেষ্টায়, তাঁরই মাধ্যমে-"ইছবাতুন নুবূয়ত" ও "রিসালায়ে তাহলীলিয়া" গ্রন্থদ্বয় আমার হস্তগত হয়। বিগত রমযানের আগে একাজে হাত দেই এবং আল্লাহর অফুরন্ত রহমতে ৩০শে রমযান, অনুবাদের কাজ শেষ করি। আলহামদু লিল্লাহ!

"ইছবাতুন নুবূওত" গ্রন্থখানি আকবরের "দ্বীনে-ইলাহীর" বিরুদ্ধে লেখা, হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে-ছানী (রহ.) এর অমর গ্রন্থ। শাহানশাহ আকবর হিজরী ৯৬৩ সাল মুতাবিক ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে হিজরী-১০১৪ সাল মুতাবিক ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০ বছরেরও অধিককাল দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর হিজরী-১০১৪ সাল থেকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল শুরু হয় এবং তিনি দীর্ঘ ২২ বছর ধরে রাজত্ব করেন।

বাদশাহ আকবরের প্রথম জীবনের ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, তিনি ইসলামী-আকীদা ও ইবাদতের বড়োই অনুসারী ছিলেন। তিনি পাক্কা নামাযী

ছিলেন এবং ঘরে কি বাইরে সর্বস্থানেই তিনি জামাতের সাথে নামায আদায় করতেন। সফরের সময় একটি খাস তাঁবু নামাযের জন্য তৈরী করা হতো। আর তিনি দ্বীনি-ইলম ও উলামায়ে কিরামকে খুবই তা'যিম করতেন এবং তাঁদের সোহবত পছন্দ করতেন। শায়খ সেলিম চিশ্‌তী (রহ.) এর প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করার জন্য তিনি ফতেহপুর সিক্রীতে রাজধানী তৈরি করেন। তিনি মাঝে মাঝে পদব্রজে আজমীর শরীফে হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী (রহ.) এর মাযার শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করতেন। জুমা'র দিন উলামাদের খাস মজলিস বসতো এবং তাতে দ্বীনি-বিষয়ে আলোচনা হতো। বাদশাহ্ এ মজলিসে যোগদান করতেন এবং আলিমদের খিদমত করতেন। বাদশার নৈকট্য ও দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে সেখানে কিছু 'উলামায়ে-সু' বা অসৎ আলিমদের সমাগম ঘটে। যাদের পরস্পর মতানৈক্য ও বিবাদ-বিসম্বাদ বাদশাকে পীড়িত ও মর্মাহত করে এবং তিনি আলিম সমাজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। 'উলামায়ে সু'র জামাতের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক ব্যক্তি ছিলেন-মোল্লা মোবারক নাগুরী এবং তার স্বনামধন্য দুই পুত্র-আবুল ফযল ও ফৈজী।

এই শয়তানী চক্রের দোসর "আলিমগণ" শাহানশাহ আকবরের মুজতাহিদ হওয়ার জন্যে একখানি সনদ রচনা করেন, যা ইতিহাসে 'মাহযার নামা' রূপে খ্যাত। এ সনদের মর্ম এরূপঃ বাদশাহ্ আকবরের ন্যায় পরায়ণতা ও ইনসাফের বদৌলতে আজ সারা ভারতবর্ষে শান্তি ও ঐক্য বিরাজমান। তিনি যে সমস্ত আলিম, জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীদের একত্রিত করেছেন তারা বাস্তবিকই যাবতীয় বিষয়ে পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী। তারা কোরআন, হাদীস, দর্শন-সর্ব শাস্ত্রেই ইমাম। তারা এ মর্মে একমত যে, বাদশাহ আকবরের মর্যাদা-একজন মুজ্‌তাহিদের মর্যাদা অপেক্ষাও উর্দ্ধে......... ।

ডাকাতের হাতে তরবারী তুলে দিলে যে পরিণাম হয়, স্বেচ্ছাচারী শাসক আকবরের হাতে এ সনদ তুলে দেওয়ার পরিণামও ঠিক তাই হয়েছিলো। তিনি তখন ইজতিহাদের মারফত কোরআন ও সুন্নাহর প্রতি জঘন্য অবমাননা প্রদর্শন করতে শুরু করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রমুখ ইমামদের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হতে লাগলো এবং কোরআন ও হাদীসকে অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক বলে আখ্যায়িত করা হলো। আল-কোরআনের ওহীকে 'বেদুঈন সর্দারের মনগড়া প্রতারণা' বলে অভিহিত করা হলো এবং নবী কারীম (সা.)-এর নুবূওত ও রিসালাতকে 'প্রহসন' আখ্যা দেওয়া হলো। এভাবে আকবরী ইজ্‌তিহাদের মারফত ইসলামী আকায়েদের ভিত্তি মূলে চরম আঘাত হানা হলো। বাদশাহ্ সাহাবীদের শানে, বিশেষ করে তিন খলীফা : হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর

খিলাফত সম্পর্কে, খন্দকের ঘটনাবলী, সিফফিনের যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ কালে এমন কঠোর সমালোচনা করতেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। তিনি নামায, রোযা ও নুবূওত সম্পর্কিত বিষয়ের নাম 'তাকলীদাত' রাখেন এবং বলেন : ধর্মের বুনিয়াদ 'নক্ল' বা কোরআন হাদীসের উপর নয়, বরং 'আক্ল' বা মুক্ত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন-শরীয়তের কোন মাসআলার বিষয় উল্লেখিত হলে-বাদশাহ্ আকবর বলতেন : ওটা মোল্লাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে জ্ঞান সম্পর্কিত কোন বিষয় হলে তা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করো।

খৃষ্টান ও অগ্নি উপাসকদের প্রভাবে বাদশাহ ঘন্টাধ্বনি ও অগ্নি-প্রজ্বলন ইত্যাদি শুরু করেন। হিন্দুস্থানের বড়ো বড়ো রাজন্যবর্গের কন্যাদের বিবাহ করায় বাদশাহর উপর তাদের বিশেষ প্রভাব পড়ে। ফলে তিনি হিন্দুয়ানী আচার আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। আকবর প্রবর্তিত দ্বীনের মাঝে এসব ধর্মের আকায়েদ, রুসুমাত ও কার্যাবলী ইত্যাদি স্থান লাভ করে।

বাদশাহ আকবর মু'জিযা এবং মিরাজকে হাসির খোরাক ব্যতীত অন্য কিছু মনে করতেন না। তিনি তার সভাসদ ও চাটুকারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন : তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, ঘুমের ঘোরে এক ব্যক্তি সাত আসমান ঘুরে এলেন এবং স্বর্গ-নরকও স্বচক্ষে দেখে এলেন? তিনি আল্লাহর সাথে আলাপ করলেন! অথচ তিনি ফিরে এসে দেখলেন-যে বিছানায় তিনি শুয়েছিলেন, সেটা তখনও গরম রয়েছে! গৃহের ছাদ ভেদ করে তিনি গেলেন, অথচ সকালে দেখা গেল, যেমন ছাদ তেমনই আছে!

'নিরক্ষর-মুজতাহিদ' বাদশাহ আকবর নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে ঐক্যের ধুয়া তুলে বহু লীলা-খেলা দেখান। দুনিয়াদার আ'লিমদের সহায়তায় তিনি ইমাম ও মুজতাহিদ হওয়ার শখ মিটিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর মনে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের 'নবী' হওয়ার সাধ জাগে! কিন্তু ইতিপূর্বে নুবূওতের মিথ্যা দাবীদারদের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে, তিনি প্রকাশ্যে নুবূওতের ঘোষণা না দিয়ে, 'তথা-কথিত ওহী' মারফত পরোক্ষভাবে এ আশা চরিতার্থ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

এ ব্যাপারে 'উলামায়ে সু'রা তাকে এরূপ পরামর্শ দেয় যে, "হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দ্বীনের সময়কাল ছিলো এক হাজার বছর-তা পূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই এখন তাঁর লালিত ইচ্ছা পূরণের পথে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই"। এ পরামর্শের ভিত্তিতে তিনি তার ভ্রান্ত ধারণাকে চরিতার্থ করার কাজে পূর্ণ উদ্যমে আত্ম নিয়োগ করেন এবং ইসলামী হুকুম-আহ্কাম বাদ দিয়ে, নিজের খুশীমত তিনি তার "দ্বীনে-ইলাহীর" জন্য নতুন নতুন কানুন জারী করতে থাকেন।

এ মতবাদকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে তিনি "শাহী সিক্কাতে" "আল্ফী-সিক্কা" হিসেবে ছাপ লাগাতে নির্দেশ দেন, এবং এর পিছনে তার উদ্দেশ্য ছিল-হাজার বছরের তারিখ প্রমাণ করা। এছাড়া তিনি "তারিখে-আল্ফী" নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়েছিলেন।

আকবরের 'তথাকথিত ওহী' প্রাপ্তির ঘটনাটি খুবই চমকপ্রদ। এ সম্পর্কে মোল্লা বাদায়ূনীর বর্ণনাটি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন : একবার শাহানশাহ্ আকবর তাঁর বিরাট বাহিনীসহ পাঞ্জাবের নান্দানা থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে তার শিকার করার শখ জাগে। তখন তিনি ক্রমাগত চারদিন ধরে শিকার করেন। শিকারকৃত পশু-পাখি স্তুপাকারে তার সামনে জমা। এমন সময় এক বৃক্ষ মূলে তিনি এক আশ্চর্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হন। তার মধ্যে চরম 'জয্বা' বা উন্মত্ততার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থা দেখে তার চেলা-চামুণ্ডারা তৎক্ষণাৎ প্রচার করে দেয় যে, "শাহানশাহ্ আকবর ওহী প্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে"।

বাদশাহর পারিষদবর্গ তাকে ধৃষ্টতার আরো একধাপে উঠিয়ে দেয়। যে বৃক্ষ-মূলে 'ওহী' পেয়ে তিনি ধন্য হন, আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে সক্ষম হন, তারা সে গাছটির নাম রাখে "মুকাদ্দাস দরখ্ত বা 'পবিত্র বৃক্ষ'। আর এ 'পবিত্র বৃক্ষের' স্মৃতিকে চির-স্বরণীয় করে রাখার জন্য তার চারপাশে মনোরম পুষ্পোদ্যান রচিত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় গগণ-চুম্বী বিরাট বিরাট প্রাসাদ, বালাখানা। পবিত্র বৃক্ষের পরিচর্যা ও দেখাশুনা করার জন্য নিয়োজিত হয় শত শত খাদিম, মালী এবং কয়েকদিন পর্যন্ত বিতরণ করা হয় গরীব-দুঃখী, ইয়াতিম ও মিসকিনদের মাঝে রাশি-রাশি আশ্রফী বা স্বর্ণ মুদ্রা।

এভাবে লালিত ও কাঙ্ক্ষিত আশা চরিতার্থ করে বাদশাহ আকবর, নিজের মাথার চুল কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে "ওহী প্রাপ্তির" শেষ শোকরিয়া আদায় করে দিল্লী ফিরে আসেন এবং জারী শুরু করেন তার "দ্বীনে ইলাহীর" নতুন নতুন ফরমান; যার বিশেষ কটি এরূপ :

১. 'দ্বীনে ইলাহীর' মূলমন্ত্র ছিল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবারু খলীফাতুল্লাহ। দুনিয়াদার আলিমরা তাকে বুঝিয়েছিল যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দ্বীনের মেয়াদ এক হাজার বছর, তা শেষ হয়ে যাওয়ায়-সে দ্বীনের কার্যকারিতা লোপ পেয়ে গেছে। কাজেই নতুন ধর্মের কালিমায় "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (সা.) এর স্থলে "আকবারু খলীফাতুল্লাহ" কথাটি সংযোজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু তাই নয়, আকবরের যুগে মুহাম্মদ (সা.)-কে রাসূল বলে স্বীকার করাটা রাষ্ট্রীয় বিধানে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে নির্ধারিত হলো। পক্ষান্তরে বাদশাহ্ আকবরের "খলীফাতুল্লাহ" বা "আল্লাহর প্রতিনিধি" হিসাবে স্বীকার করা প্রজা-সাধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য বলে সাব্যস্ত হলো।

২. 'দ্বীনে-ইলাহী' গ্রহণ করতে হলে সকলকে স্বীয় ধর্মমত পরিত্যাগ করতে হতো। যারা এ দ্বীন গ্রহণ করতো, তাদের 'চেলা' বলা হতো। শাহানশাহ্ তার চেলাদের প্রত্যেককে নিজের ক্ষুদ্র একখানি ফটো দিতেন, যা তারা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে তাদের পাগড়ীর সাথে লাগিয়ে রাখতো।

২. 'দ্বীনে-ইলাহী' গ্রহণের সময় চেলারা যে "আহাদ-নামা" বা অংগীকার পত্র দিত, তা এরূপ : আমি অমুকের পুত্র অমুক এ যাবত বাপ-দাদার অনুসরণ করে যে 'দ্বীন-ইসলাম' মেনে আসছিলাম, তা থেকে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্রাট আকবরের 'দ্বীনে-ইলাহীতে' দাখিল হচ্ছি এবং এ ধর্মের খাতিরে জান, মাল, ইজ্জত ও পূর্ব ধর্মকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি।

৩. ইসলামী আকায়েদের অন্যতম প্রধান অংগ-আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস। 'দ্বীনে-ইলাহী' এ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে, তার পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্য ও চানক্য-সমাজের পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে। বাদশাহ নিজেও এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, মৃত্যুর পরও তিনি অন্য কোন স্বর্ণ সিংহাসনের অধিকারী হয়ে অনুরূপ প্রতিপত্তির সাথে পুনরায় আবির্ভূত হবেন।

৪. আল-কোরআনের ভাষা আরবী করাকে অমার্জনীয় অপরাধ এবং কোরআন ও হাদীসের শিক্ষার্থীগণকে 'মরদুদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এজন্য মাদ্রাসা-মসজিদ ধ্বংস করা হয় এবং হক্কানী আ'লিমদেরকে নির্বাসিত করা হয়।

৫. হিন্দুদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মাহে-রমযানের প্রতি করা হয় মর্মন্তুদ অবমাননা পক্ষান্তরে, হিন্দুদের একাদশীর সম্মানের খাতিরে মুসলিমদেরকে তাদের দৈনন্দিন পানাহার ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। কোন মুসলমান এজন্য প্রতিবাদ করলে, তাকে প্রাণদণ্ডেও দণ্ডিত করা হতো।

৬. চানক্য পণ্ডিত মশায়দের প্ররোচনায় আকবর 'দ্বীন-ইসলামকে' হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে-নামায, রোযা ইত্যাদির প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য, দরবারের পণ্ডিতদের দ্বারা এসব বিষয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক রচনা লিখিয়ে তা সাধারণ্যে প্রচার করতেন।

উপরে আলোচিত 'দ্বীনে-ইলাহীর' কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় যে, শাহানশাহ্ আকবর তার রাজত্বকালের দীর্ঘায়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য এবং হিন্দুদের মনোস্তুষ্টির খাতিরে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর জঘন্য হামলা করেন। এর ফলে, হিন্দুরা তাকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" উপাধিতে ভূষিত করে। হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে এতো বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, যা অকল্পনীয়। পক্ষান্তরে, ইসলাম তথা মুসলমানদের ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা একেবারেই খর্ব করা হয়। যেমন হযরত মুজাদ্দিদ-ই আল্‌ফে ছানী (রহ.) তাঁর মাকতুবাত শরীফের দ্বিতীয় দফতরের ৯২নং মাকতুবে বলেছেন :

হিন্দুস্থানের মুশরিকরা অবাধে ও নির্ভীকচিত্তে মসজিদসমূহ বিনাশ করে, তদস্থলে মন্দির নির্মাণ করেছে। আক্ষেপের বিষয় যে, কাফিররা প্রকাশ্যে, মহাসমারোহের সাথে তাদের কুফরী কাজের অনুষ্ঠান করে, অথচ অধিকাংশ মুসলমান ইসলামী হুকুম আহকাম পালনে অক্ষম এবং তাদের উপর নানা রকম বাঁধা নিষেধের খরগ।

বাদশাহ আকবর এরূপ প্রচার করেন যে, ওহী বা প্রত্যাদেশ বলে কিছুই নেই। কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এটা বিশ্বাস করতে পারে না। এ হলো বেদুঈন সর্দারের মনগড়া কথা।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, তথাকথিত নামধারী-আ'লিম এবং তাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত দুনিয়া লোভী-রাজা-বাদশাহরা যুগে-যুগে ইসলামের সমূহ ক্ষতি করেছে এবং আজো করছে আর এদের স্বার্থের কবল থেকে দ্বীন-ইসলামকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসংখ্য 'মুজাদ্দিদে-দ্বীন' দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে তথাকথিত আ'লিমদের কারসাজিতে, বাদশাহ কর্তৃক 'দ্বীনে-ইলাহী' নামে এক ইসলাম বিরোধী নতুন ধর্মের জন্ম হয়; যার ফলে এ উপমহাদেশ থেকে ইসলাম চিরতরে নির্মূল হওয়ার উপক্রম হয়। এ দুঃসময়ে ইসলাম রক্ষা কল্পে, শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.) আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদরূপে প্রেরিত হন এবং তিনি তাঁর বিপ্লবী সংস্কারের দ্বারা সারা হিন্দুস্থানে দ্বীন-ইসলামকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করেন, যে সংস্কারের ধারা অদ্যাবধি চলছে।

হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) রচিত মাকতুবাত শরীফ পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি তাতে হিন্দুস্থানে ইসলামের এ দুর্দিনের কথা বার বার আলোচনা করেছেন। মাকতুবাত শরীফের উক্ত আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, সমসাময়িক বাদশাহ, শাসন ব্যবস্থা ও "উলামায়ে 'সুর" কার্যকলাপ ইসলামের জন্য ব্যাপক ফিত্না স্বরূপ ছিল। বাদশাহ আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত দ্বীনে-ইলাহী ছিল তথাকথিত "উলামায়ে সুর" কার্যকলাপের জের এবং এ ধর্ম-মতকে এজন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যাতে হিন্দুস্থানের বুক থেকে চিরতরে দ্বীন-ইসলাম মিটে যায়।

সংগত কারণে আরো উল্লেখ্য যে, আকবরী শাসনামলের কাহিনী লেখক বহু রয়েছেন এবং অবস্থার আবর্তনে কাহিনী ও ঘটনার বিভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। কেননা, বিশ্বাস ও দলগত স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে লেখায় বাস্তব ও অবাস্তব উভয়বিধ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) এর মাকতুবাত শরীফের বর্ণনামতে একথা সুস্পষ্ট যে, আকবরী শাসনামলে ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকে হিন্দুস্থানে ইসলামের ঘোর দুর্দিন বিদ্যমান ছিল। এমনকি হিন্দুস্থান থেকে

ইসলামকে মুছে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) এর বর্ণনার সমর্থনে তৎকালীন ঐতিহাসিক মোল্লা আব্দুল কাদির বদায়ুনী রচিত সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থ 'মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ' বিশেষ নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। যদিও কোন কোন স্বার্থান্বেষী লেখক কল্পনা-প্রসূত ধারণার বশবর্তী হয়ে ঐতিহাসিক মোল্লা বদায়ুনীর সমালোচনা পূর্বক তাঁর লিখিত ইতিহাসকে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বলার চেষ্ট করে থাকেন। এক্ষেত্রে সংগত কারণে বলা যেতে পারে যে, মোল্লা বদায়ুনী লিখিত গ্রন্থের অসারতা প্রমাণের জন্য তৎকালীন সময়ে লিখিত আর একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ পেশ করা দরকার। অন্যথায় কল্পনার বশবর্তী হয়ে অহেতুক কিছু বলা জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোকের কাজ নয়।

অতএব, বাস্তবতার দৃষ্টিতে বলা যায় যে, যখন হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) এর মাকতুবাত শরীফ ও ইছবাতুন নুবূওতে পরিবেশিত তথ্যের সাথে মোল্লা বদায়ুনীর তথ্যের মিল রয়েছে, তখন মোল্লা সাহেবের তথ্য ও বিবরণ নির্দ্বিধায় অকাট্য সত্যরূপে গ্রহণ করা যায়।

শাহানশাহ্ আকবরের তথাকথিত "ওহী-প্রাপ্তি" এবং সে মতে নতুন দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরোক্ষভাবে নুবূওতের মিথ্যা দাবীর অসারতা প্রমাণের জন্য হযরত মুজাদ্দিদ-ই আল্‌ফে ছানী (রহ.) সে সময়েই রিসালাখানি রচনা করেন; তন্মধ্যে সত্য নবীগণের নুবূওত প্রমাণের লক্ষ্যে অকাট্য দলিল, উপমা, উদাহরণ পেশ ও তাত্ত্বিক আলোচনা দার্শনিক দৃষ্টি ভংগীতে জোরদারভাবে করেছেন। তথাকথিত দার্শনিক ও মুক্ত-বুদ্ধির দাবীদারদের সমালোচনা তিনি কঠোরভাবে করেছেন এবং সত্য জ্ঞান যে একমাত্র কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান-অকাট্য দলিল ও যুক্তি দিয়ে তা পেশ করেছেন। বর্তমান বিশ্বের ফিতনাময় পরিবেশে "ইছবাতুন নুবূওত" গ্রন্থখানি সঠিক আলোর দিশা দিতে সক্ষম। বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকদের জন্য গ্রন্থখানি কোন উপকারে আসলে আমার চেষ্টা ও শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

পরিশেষে, রাব্বুল আলামীনের দরবারে আরয, তুমি এ নালায়েক ও গুনাহগারের চেষ্টা কবুল কর এবং তোমার দ্বীনের স্বার্থে এ গ্রন্থখানি গ্রহণ কর, আর আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ব্যবস্থা কর, আমীন! ছুম্মা আ-মীন!!

–ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক

মুকাদ্দামা

আল্লাহ তা'আলার দরবারে এজন্য লাখো-কোটি শোকর যে, এই প্রথম বারের মত হযরত ইমামে রাব্বানী-মুজাদ্দিদ-ই-আলফে ছানী (রহ.) এর দুষ্প্রাপ্য কিতাব 'ইছবাতুন নুবূওত' প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ হলো। বাদশাহ আকবর হিজরী ৯৯৪ সন থেকে ১০০৭ সন পর্যন্ত লাহোরে অবস্থান করেন এবং ইতিপূর্বে তিনি আগ্রায় বসবাস করতেন। হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে ছানী (রহ.) (হিজরী-৯৭১-১০৩৪) ২০-২২ বছর বয়সে আগ্রায় তাশরীফ নিয়ে যান। তখন ফৈযী সেখানে তার বিখ্যাত নুকতা বিহীন তাফসীর 'সাত্তাতিউল্ ইলহাম' গ্রন্থ রচনায় রত ছিলেন। কথিত আছে যে, হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) এ তাফসীর রচনায় একটি নুকতা বিহীন বাক্য রচনা করে দেন।[১] সম্পাদনার পর উক্ত তাফসীরটি হিজরী ১০০২ সনে প্রকাশিত হয়।[২]

বাদায়ুনী বলেন : আবুল ফযল, ফৈযী এবং তাদের পিতা মোল্লা মোবারক নাগুরীর কারণে, হিজরী-৯৮৭ সন থেকে দ্বীনের মধ্যে এবং বিশেষভাবে নুবূওতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়।[৩] তাছাড়া ধর্মহীন লেখকেরা তাদের গ্রন্থের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি সম্মান সূচক সম্বোধনকে পরিহার করে। এ সময়ে একবার আবুল ফযল হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে ছানী (রহ.) এর সম্মুখে হযরত ইমাম গাযযালী (রহ.)-কে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ হিসাবে আখ্যায়িত করেন, যার ফলে তিনি তার প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হন এবং তার সাথে দেখা সাক্ষাতের সিল্‌সিলা বন্ধ করে দেন। হিজরী ৯৯০ সন থেকে হক্‌পন্থী আ'লিমদের উপর নির্বিচারে অত্যাচারের ষ্টিম-রোলার চালানো শুরু হয়; অনেককে কত্‌ল করা হয় এবং প্রাণভয়ে অনেকে দেশ ত্যাগ করেন।[৪]

হিন্দুস্থানের মুসলিম মিল্লাতের উপর আপতিত এ ফিত্‌নার উল্লেখ "ইছবাতুন নুবূওত" গ্রন্থে আছে। এজন্য ধারণা করা হচ্ছে যে, গ্রন্থটি হিজরী

---

[১] দেখুন, যুব্‌দাতুল মাকামা, মাওলানা হাশিম কাশ্‌মী, প্রকাশিত লাখনৌ ১৩০৭ হিঃ পৃষ্ঠা-১৩২।

[২] দেখুন, মুন্‌তাখাবুত তাওয়ারীখ, মোল্লা আব্দুল কাদির বাদায়ূনী, লাখনৌ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। পৃষ্ঠা-৩৮৯।

[৩] প্রাগুক্ত, ৩২৫ পৃঃ।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৯, ৩৪১ ও ৩৬১।

৯৯০ সনের কাছাকাছি সময়ে লিখিত হয়।[৫] এখন সে ফিত্না সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে, যাতে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে ছানী (রহ.) এর বিপ্লবী খিদ্মাত ও সংস্কারের সঠিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

মোল্লা আব্দুল কাদির বাদায়ুনী, তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে হিজরী-১০০৪ সন পর্যন্ত সময়কার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় জানা যায় যে, প্রাথমিক জীবনে বাদশাহ আকবর সত্যান্বেষী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে 'উলামায়ে সু' বা অসৎ আ'লিম এবং গোমরাহ সুফীদের প্ররোচনায় পড়ে দ্বীন-ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।[৬]

গুজরাটের শাসনকর্তা ইবরাহীম বাদশাহ আকবরের দরবারে যে উপঢৌকন পাঠান, তন্মধ্যে 'ইবনুল-আরাবীর' সাথে সম্পর্কিত এ ধরনের একটি জাল হাদীস বর্ণিত ছিল : 'সাহেবে-যামান'[৭] বা বর্তমান সময়ে শাসনকর্তার কাছে অনেক মহিলা থাকবে এবং তার মুখে দাঁড়ি থাকবে না।[৮]

খাজা সিরাজী নামক জনৈক ব্যক্তি মক্কা মুআয্যামা থেকে "মাহদীর-প্রকাশ" নামীয় একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আনে যা আসলে জাল ছিল।[৯] শরীফ আমলী নামক জনৈক শিয়া আ'লিম এ ধরনের একটি অভিমত প্রকাশ করে যে, 'সত্য-দ্বীন' অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম কায়েম থাকার জন্য নির্ধারিত সময় হলো ৯৯০ হিজরী পর্যন্ত। অতঃপর অন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে।[১০]

আবুল ফযল ও ফৈযীর পিতা মোল্লা মোবারক নাগুরী এর আগেই এ ধরনের একটি "মাযহার-নামা" বা সনদ পত্র তৈরী করে, যাতে সে আকবরকে মুজতাহিদ হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং ফৈজী তার জন্য জুম'আর দিনের-খুতবাহ ফার্সী কবিতায় লিখে দেয় এবং আকবরকে 'খলীফায়ে যামান' বা যামানার খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।[১১] নামায, রোযা এবং ইসলামের অন্যান্য অনুশাসনকে 'তাকলীদাত' বা জ্ঞান-বহির্ভূত কাজ হিসেবে আখ্যা দেয়।[১২] জ্ঞানের বাহাদুরী পরিদর্শন করে আবুল ফযলের তত্ত্বাবধানে বাদশার মহলের

---

[৫] দেখুন, যুব্দাতুল মাকামা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।
[৬] দেখুন মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৮।
[৭] অর্থাৎ শাহানশাহ্ আকবর।
[৮] দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৪।
[৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৪।
[১০] প্রাগুক্ত।
[১১] দেখুন, মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, পৃঃ ৩২৫।
[১২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৭।

মাঝে একটি 'আতশ-খানা' বা শিখা-অনির্বাণ তৈরী করা হয়, আকবর যার পূজা করতেন।[১৩]

আকবরের মহলে নাসারাদের অনুসরণ ও অনুকরণে ঘন্টা ধ্বনি করা হতো। ত্রিত্ত্ববাদের মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং নাসারাদের ধরনে আকবর ওজীফা করতেন।[১৪] হিন্দু রাজা, মহা-রাজাদের কন্যা বিবাহ করার কারণে বাদশার মন মেজায ও আমল আকীদা তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।[১৫] হিন্দু রাণীদের প্রভাবের কারণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, কৃষ্ণ, মহামায়া ও অন্যান্য দেবতাদের তা'যীম করা হতো।[১৬]

বাদশাহ আকবর দিনের মধ্যে চার বার সূর্যের উপাসনা করতেন। সূর্যের নামে হাজার দানার মালায় আকবর জপ করতেন। তিনি পৈতা ব্যবহার করতেন। আগুন, পানি, গাছ-বৃক্ষ এবং অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থ-এমনকি গাভী এবং গোবরের পূজাও বাদশাহ আকবর করতেন।[১৭] আল্লাহ পানাহ! তিনি শুকরকে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশের স্থান বলে মনে করতেন।[১৮] আকবর গরুর গোশ্‌ত খাওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং শুকর খাওয়া বৈধ করেছিলেন।[১৯] তিনি সুদ, শরাব ও জুয়াকে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন।[২০] আকবর একটি সরকারী শরাব খানা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যার পরিচালনার দায়িত্ব ছিল জনৈক শরাবীর যুবতী কন্যার উপর।[২১] আকবর দাঁড়ি মুণ্ডন প্রথা চালু করেন[২২] এবং তার দরবারের উযীর, নাজীর ও অমাত্যবর্গ তার অনুসরণে নিজেদের দাঁড়ি মুণ্ডন করতো।[২৩] তার সময়ে নাপাকীর কারণে গোসল করাকে বেহুদা মনে করা হতো।[২৪]

আকবর ষোল বছর বয়সের আগে ছেলেদের এবং চৌদ্দ বছর বয়সের আগে মেয়েদের বিবাহ শাদী দেয়াকে অবৈধ ঘোষণা করেন।[২৫] পর্দা প্রথা রহিত করে,

---

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২১।
[১৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৩।
[১৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪২।
[১৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৯।
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৩।
[১৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৩।
[১৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪২।
[২০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪০।
[২১] দেখুন মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, পৃঃ ৩৪২।
[২২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪২।
[২৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮২।
[২৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৩।
[২৫] প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪৪।

যুবতী নারীদের মুখ খোলা অবস্থায় রাস্তায় চলার নির্দেশ দেন এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে বেশ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬] আকবর ছেলেদের খাতনার বয়স বার বছর নির্ধারণ করেন, উদ্দেশ্য বয়স বৃদ্ধির কারণে ছেলেরা যাতে আর খাতনা করতে না চায়।[২৭] আকবর মৃত ব্যক্তিদেরকে পানিতে নিক্ষেপ করতে, জ্বালিয়ে দিতে, কিম্বা গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখতে নির্দেশ প্রদান করেন।[২৮] আর তিনি নিজে পশ্চিম দিকে পা দিয়ে শয়ন করতেন এবং মুর্দাকে কবরে রাখার সময় তার পদদ্বয় কিবলামুখী করে রাখতে নির্দেশ দিতেন।[২৯] আকবর অন্য লোকদেরকে তাকে সিজদা করার জন্য বাধ্য করতেন।[৩০] এবং তিনি ইসলামী বিধানের বিরোধিতা করে, কুকুর ও শুকর যে নাপাক এ বিধান বাতিল ঘোষণা করেন এবং শাহী মহলের নীচে এ দু'টি জন্তুকে যিয়ারতের জন্য রাখা হয়েছিল এবং বলা হতো : এদের দর্শন করাও ইবাদত।[৩১] যদি কোন কশাই কারো সাথে খানা খেত, তবে তার হাট কেটে দেওয়া হতো; আর যদি তার বিবি তার সাথে খানা খেত তবে তার হাতের আংগুল কেটে দেওয়া হতো।[৩২]

শাহানশাহ আকবর হিন্দু মুনি ঋষিদের প্রভাবের কারণে জন্মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন[৩৩]; তিনি আরবী পড়াকে দোষের বিষয় বলে মনে করতেন।[৩৪] আকবর রেশমী কাপড় পরিধান করাকে বৈধ মনে করতেন এবং তার পারিষদ বর্গের জন্য এরূপ বস্ত্র পরিধান করতে বাধ্য করতেন।[৩৫] আবুল ফযলের সামনে আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনের কথা যদি পেশ করা হতো, তখন সে ব্যংগ করে বলতো তোমার আমার সামনে অমুক মিষ্টান্ন বিক্রেতা, অমুক কাপড় বয়নকারী এবং অমুক চর্মকারের কথা পেশ করছো? আশ্চর্য![২৩৬] সাহাবায়ে কিরাম (রা.), ফিদাক, সিফফিনের যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কিছু আলোচিত হলে, আবুল ফযল এ সম্পর্কে এমন জঘন্য উক্তি করতো, যা কানও শুনতে ঘৃণা বোধ করে।[৩৭]

---

[২৬] প্রাগুক্ত ৩৪১।
[২৭] প্রাগুক্ত ৩৮০।
[২৮] প্রাগুক্ত ৩৮৮।
[২৯] প্রাগুক্ত ৩৭০।
[৩০] প্রাগুক্ত ৩২০।
[৩১] প্রাগুক্ত ৩৪৩।
[৩২] প্রাগুক্ত ৩৮০।
[৩৩] প্রাগুক্ত ৩৪০।
[৩৪] প্রাগুক্ত ৩৪৪।
[৩৫] দেখুন মুন্‌তাখাবুত তাওয়ারীখ, প্রাগুক্ত ৩৪৪।
[৩৬] প্রাগুক্ত ২৯২।
[৩৭] প্রাগুক্ত ৩৪৫।

আকবরের সময় এরূপ বলা হয় যে, কোরআন-সৃষ্ট; ওহী অসম্ভব ব্যাপার; আর মি'রাজ ও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হতো।[৩৮]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ আহমদ মুহাম্মদ মুস্তফা এ জাতীয় নামকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়।[৩৯] হিন্দুরা তো হিন্দুই ছিল; আক্ষেপ! হিন্দু মেজাযের মুসলমানরাও হুজুর (সা.) এর নুবূওতের অস্বীকারকারী হয়ে যায়। অপরপক্ষে অভিশপ্ত নাসারারা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দাজ্জাল হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকে (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)।[৪০] এসব সত্ত্বেও আকবরের ভ্রু সামান্যতম কুঞ্চিত হয়নি। সম্ভবতঃ ইসলামের ইতিহাসে দ্বীন ইসলামের দুর্দশার একটি করুণতম নজির হলো আকবরের শাসনামলের এ সময়টি।

উপরন্তু আবুল ফযলের জনৈক ভাই যে তার শাগরিদও ছিল, ইসলামী-ইবাদতের খেলাফ একটি বই লিখে খুবই পরিচিত হয়ে ওঠে এবং এ দিয়ে সে অনেক টাকা পয়সা কামিয়ে নেয়।[৪১] ফৈযী এমনই অহংকারী ছিল যে, সে কথায় কথায় সাহাবায়ে-কিরাম, সল্‌ফে-সালেহীন এবং দ্বীন-ইসলামকে ঘৃণা করে কথা বলতো। ফৈযী মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় এবং স্ত্রী সহবাসের পর নাপাক অবস্থায় থেকে তার লিখিত তাফসীর 'সাত্তাতিউল-ইলহাম' রচনা করতো।[৪২] সে ঝগড়ার সময় কুকুরের মত চিৎকার দিত।[৪৩] উপরোক্ত খাবাসাতের[৪৪] কারণে পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে হিন্দুস্থানের বুক থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মিটে যায়। সমস্ত মসজিদ হিন্দুদের ফরাশখানা ও চৌকীখানায় রূপান্তরিত হয়।[৪৫]

গোটা হিন্দুস্থানের অবস্থা যখন এরূপ, তখন হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফেছানী (রহ.) খান-খানান, সদরে-জাহান, খানে-আ'জম, খানে জাহান, মহব্বত খান, তরবিয়ত খান, ইসলাম খান, দরিয়া খান, সিকান্দর খান, মুরতজা খান প্রমুখ বিশিষ্ট আমীর-উমরাদেরকে স্বীয় হালকাভুক্ত করতে সক্ষম হন এবং তিনি তাঁদের দ্বারা, পরবর্তী বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মন-মানসিকতা দ্বীন-ইসলাম মুখী করার জন্য সচেষ্ট হন। যার ফলশ্রুতিতে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁর শিষ্যে

---

[৩৮] প্রাগুক্ত ৩৪৭।

[৩৯] প্রাগুক্ত ৩৪৮।

[৪০] প্রাগুক্ত ৩২১।

[৪১] প্রাগুক্ত ৩৪৪।

[৪২] দেখুন মুন্‌তাখাবুত তাওয়ারীখ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫১৫।

[৪৩] প্রাগুক্ত।

[৪৪] অশ্লীল, অপকর্মের ফলে।

[৪৫] প্রাগুক্ত ৩১৭।

পরিণত হন এবং শাহজাদা খুররম বা শাহজাহানকে তাঁর হাতে বয়আ'ত করান। এর ফলে, আকবরের সময় তার দরবারে প্রচলিত সিজদায়ে-তা'যিমী, বা সম্মান-সূচক সিজদা রহিত করা হয়। গরু যবেহ আবার চালু হয়, যে সব মসজিদ ভেঙ্গে-গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি আবার তৈরী করা হয়। জাহাঙ্গীরের সময় যে চিত্র-শিল্প উন্নতি লাভ করেছিল, তা পরিত্যক্ত হয় এবং লোকেরা নির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়ে। শাহজাহান ছাড়া আওরঙ্গজেবও হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে ছানী (রহ.) এর খান্দানের তারবীয়তের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন। আর তাঁরই সময়ে ফিকাহ শাস্ত্রের সব চাইতে বড় কিতাব 'ফতোয়ায়ে আলমগীরি' রচিত হয়। শাহী দরবারে আলিম উলামাদের সম্মান ও কদর বেড়ে যায়।[৪৬]

পরবর্তী কালে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে ছানী (রহ.) এর শাগ্‌রেদদের সিল্‌সিলার মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহ.), হযরত মাযহার জানে-জান (রহ.), শাহ গোলাম আলী (রহ.), কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.), মাওলানা খালেদ রূমী (রহ.), 'ফতোয়ায়ে-শামী' গ্রন্থের রচয়িতা-শাহ আব্দুল গণি মুজাদ্দিদী (রহ.)-এর মত ব্যক্তি পয়দা হন। মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী এবং মাওলানা রশীদ আহমদ মাযহার সাহারানপুরী (রহ.) শাহ আব্দুল গনী (রহ.) এর শাগ্‌রেদ ছিলেন। এসব যিন্দাদিল উলামা ও মাখায়েখগণ দ্বীনের এমনই খিদ্‌মত করেন যে, তার ফল বহু সুদূর প্রসারী হয়। এমনকি আজকের হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামের তাহযীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-কালচারের যে চর্চা পরিলক্ষিত হয়, তা অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে গৌরবের বিষয়; আর এর মূল কারণ হলো মুজাদ্দিদে-ই-আল্‌ফে ছানী (রহ.) এবং তাঁর খান্দান ও সিল্‌সিলার মাশায়েখদের আত্ম-নিবেদিত দ্বীনের খেদমত।

বস্তুতঃ বলা যায় যে, হিজরী ১০০১ থেকে আজ পর্যন্ত দ্বীনের ব্যাপারে যে সমস্ত প্রশ্নাদি উথিত হয়েছে এবং আগামী এক হাজার বছর যে সমস্ত প্রশ্ন উঠবে (যদি পৃথিবী-ততদিন স্থিতিশীল থাকে), এসবের ফয়সালা হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে ছানী (রহ.)-এর রচিত অমর গ্রন্থ 'মাকতুবাত শরীফের' মধ্যে স্পষ্টতঃ বা অস্পষ্টতঃ বিদ্যমান আছে। বলুন তো-তাঁর এই বিরাট ও বিশাল খিদ্‌মাত, তাঁর দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য কি যথেষ্ট নয়? এর চাইতে বড় দলীল আর কি হতে পারে?

উপরে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে ছানী (রহ.)

---

[৪৬] প্রাগুক্ত ৩৫৩।

'ইছবাতুন নুবূওয়াহ' গ্রন্থটি আগ্রায় থাকাকালীন সময়ে রচনা করেন। এই পাণ্ডুলিপিটি খুবই দুষ্প্রাপ্য। মৌলবী জামিলুদ্দীন আহমদ[৪৭] খান্‌কায়ে সিরাজিয়া, কুন্দিয়ান, মিয়া-নত্তালী; ৩রা মুহাররাম, ১২৪২ হিজরীর পাণ্ডুলিপি থেকে এটি কপি করে নেন। খানকায়ে মাযহারীয়া, দিল্লী থেকে মাওলানা যায়েদ আবুল হাসান ফারুকী মুজাদ্দেদী, হিজরী ১২৬৯ সনে নকলকৃত পাণ্ডুলিপি থেকে এটি কপি করে নেন। অবশেষে, হাজী মুহাম্মদ আলা, ডক্টর গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের মধ্যস্থতায়, মাওলানা হাশিম জান সাহেব থেকে, খান মুহাম্মদ তালপুর লিখিত একটি কপি সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত এ তিনটি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে, বর্তমান সংস্করণ'টি যোগ্য আ'লিমদের সহযোগীতায় প্রকাশ পেল। আল্লাহ পাক সকলকে এর যোগ্য বিনিময় প্রদান করুন! আমীন!!

ওয়াস সালাম!

আহকার-গোলাম মোস্তফা খান।

এম, এ; এল, এল, বি, পি-এইচ-ডি; ডি-লিট,

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, উর্দু সিন্ধু বিশ্ব্যবিদ্যালয়, হায়দরাবাদ।

১৭ই রমযান, হিজরী ১৩৮৩ সন।

---

[৪৭] নক্‌শবন্দী ও মুজাদ্দিদী হওয়া ছাড়াও, শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) মাওলানা তাহির মক্কী ও হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ) থেকে হাদীসের সনদ হাসিল করেন। দেখুন 'কাওলুল-জামিল' গ্রন্থটি।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম অধ্যায়

ইছবাতুন্ নুবূওত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআ'লার জন্য যিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়াতসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর উপর বিশেষ কিতাব আল-কোরআন-নাযিল করেন, যার মাঝে সামান্যতম বক্রতা ও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, বরং তা সরল ও সহজ; যাতে তিনি লোকদেরকে ঐ ভয়ানক আযাব থেকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন, যা আল্লাহর তরফ থেকে অত্যাসন্ন, আর মুমিনদেরকে খোশ-খবর শোনাতে পারেন তাদের নেক আমলের, যা আল্লাহর তরফ থেকে উত্তম নিয়ামত স্বরূপ-জান্নাত। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর হাবীবের মাধ্যমে স্বীয় দ্বীনকে পূর্ণতা প্রদান করেছেন এবং তাঁর উপর স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন এবং দ্বীন-ইসলামকে তাঁর জন্য পছন্দ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণের মাধ্যমে নবী ও রাসূলগণের আগমনের সিলসিলা বা ধারা খতম করে দিয়েছেন। যাঁরা মাখলুকের প্রতি প্রকাশ্যে দলীল ও বড় বড় মু'জিযা নিয়ে আগমন করেন, যাতে মানুষেরা ঐ সমস্ত নবীগণের প্রতি নিজেদের ঐরূপ সমর্পণ করে, যেমন অন্ধ ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করে তার পথ প্রদর্শকের উপর, কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি নির্ভরশীল হয় বিজ্ঞ চিকিৎসকের উপর। ফলে, তার থেকে এমন উপকার প্রাপ্ত হয় যা চিন্তা ও ভাবনার বাইরে।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রাসূলগণের মধ্যে সর্বোত্তম, মিল্লাতের দিক থেকে মধ্যপথ অবলম্বী এবং দ্বীন ও শরীয়তের দিক দিয়ে সব চাইতে সঠিক রাস্তা প্রদান করেন।

যাঁর শেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى. لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى.

অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি টেরা হয়নি এবং অবাধ্য হয়নি, বরং তিনি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেন।[৪৮]

এ আয়াতে খবর দেয়া হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই একমাত্র রাসূল যাঁকে সমস্ত মাখ্লুকের প্রতি পাঠানো হয়েছে,

---

[৪৮] আল-কোরআন, ২৭ সূরা নজম, আয়াতঃ ১৭-১৮

যাতে তিনি সকলের কাছে আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদের দা'ওয়াত দেন, তাদেরকে ইল্‌ম ও আমলের শক্তিতে শক্তিশালী করেন এবং তাদের রোগগ্রস্ত দিলের চিকিৎসা করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীবের উপর স্বীয় রহমতের ধারা-অজস্র ধারায় বর্ষণ করুন; কেননা, তিনিই তার যোগ্য প্রাপক এবং সে রহমতের ধারায় স্নাত হোক তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণ, যাঁরা হিদায়েতের আলোকবর্তিকা স্বরূপ এবং অমানিশার মাঝে আলো স্বরূপ; যতদিন হিদায়াত ও গোমরাহী একের পর এক আসতে থাকে-তাঁদের উপর আরো অধিক শান্তি ও স্বস্তি নাযিল হোক! আমীন!

হাম্‌দ ও সালাতের পর বক্তব্য হলো : আল্লাহ তা'আলার রহমতের মুখাপেক্ষী আহমদ ইব্‌ন আব্দুল আহাদ ইব্‌ন যয়নুল আবেদীন (রহ.) বলেন যে, এ যুগে যখন আমি দেখি আসল নুবূওত সম্পর্কে লোকদের ধারণায় (জনৈক ব্যক্তির[৪৯] নুবূওতের দাবীর প্রেক্ষিতে এবং নুবূওতের ভিত্তিতে শরীয়তের কর্মকাণ্ডে) বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং লোকদের মাঝে এ প্রবণতা ব্যাপকতর হচ্ছে; এমনকি আমাদের সময়ের জনৈক যালিম বাদশাহ[৫০] অসংখ্য আলিম-উলামাদের উপর এজন্য কঠোর শাস্তি ও অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে যে, তাঁরা শরীয়তের হুকুমের অনুসরণ করে এবং নবী রাসূলগণের উপর দৃঢ় ঈমান রাখে। সে কারণে আহলে ইসলামের অসংখ্য আলিমকে হত্যা করা হয়েছে এবং এখন অবস্থা এমন নাজুক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সে বাদশাহ তার দরবারে হযরত খাতেমুল আম্বীয়া আ'লাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের নাম উচ্চারণ করাকেও স্পষ্টত পরিহার করেছে এবং যাদের 'আহমদ' ও 'মুহাম্মদ' নাম ছিল তা পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখা হয়েছে। গরু যবেহ করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ হিন্দুস্থানের বুকে গরু কুরবানী করা ইসলামী নিদর্শনের অন্যতম। মসজিদসমূহ ও মুসলমানদের কবরস্থান সমূহ ধ্বংস করা দেওয়া হয়েছে, অথচ কাফিরদের 'ইবাদতগাহ'[৫১] সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং রসম-রেওয়াজ ও পূজা-পার্বণের প্রতি সম্মান দেখানো হচ্ছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, সে বাদশাহ ইসলামের বিধি-বিধান ও রসম-রেওয়াজ ও তার পবিত্র স্থানগুলিকে অপবিত্র ও বাতিল ঘোষণা করেছে এবং কাফিরদের বাতিল-মাজহাব ও রস্‌ম-রেওয়াজকে[৫২] প্রচার করছে।

---

[৪৯] বাদশাহ আকবরের।

[৫০] প্রাগুক্ত।

[৫১] মন্দির।

[৫২] রীতি-নীতি।

এমনকি সে বাদশাহ হিন্দুস্থানের কাফিরদের 'হুকুম-আহকাম' প্রচার করছে এবং তাদের আসল ভাষা-সংস্কৃতিকে ফার্সীতে রূপান্তরিত করছে, যাতে ইসলামের নাম-নিশানা ও প্রভাব প্রতিপত্তি হিন্দুস্থানের বুক থেকে চিরতরে মুছে যায়।

যখন আমি বুঝতে পারি যে, সন্দেহ ও অস্বীকারের ব্যাধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। এমনকি চিকিৎসকগণও তাতে আক্রান্ত হয়েছে এবং মাখলুক ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, তখন আমি মানুষের আকীদা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে থাকি এবং তাদের এ ধরনের সন্দেহের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকি। এ পর্যায়ে আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের এ সন্দেহ ও বদ্ আকীদার মূল কারণ হলো : তাদের ঈমানের দুর্বলতা, নুবূওতের যুগ থেকে দূরবর্তীতা, ভূঁয়ো দর্শন শাস্ত্রে লিপ্ততা এবং হিন্দুস্থানের তথাকথিত জ্ঞানী-গুণীদের পুস্তকাদি পাঠে জ্ঞান লাভ করা।

এ পর্যায়ে আমি কিছু লোকের সাথে তর্কযুদ্ধেও অবতীর্ণ হই, যারা দর্শন শাস্ত্র পাঠ করেছিল এবং কাফিরদের রচিত পুস্তকাদি পাঠ করে জ্ঞানী-গুণী সেজে বসেছিল। এরাই লোকদেরকে গোমরাহ করে এবং আসল নুবূওতের ধারণাকে বাদ দিয়ে তারা তা জনৈক[৫৩] ব্যক্তির জন্য নির্ধারণ করে; ফলে, তারা নিজেরাও গোমরাহ হয়। তারা এরূপ উক্তি করতে থাকে যে, নুবূওত প্রাপ্তির যোগ্যতা হলো : জ্ঞানী-গুণী হওয়া, মানুষের বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা, সাধারণ মানুষের ভোগ-সম্ভারে স্বাধীনতা দেওয়া এবং পরস্পরের মতানৈক্য ও মতভেদ থেকে বিরত রাখা, এর সাথে আখিরাতের নাজাত ও মুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। বরং আখিরাতের নাজাতের চাবিকাঠি হলো : উন্নত চরিত্র হাসিল করা এবং জ্ঞানীগণ তাদের কিতাবে অধিক উন্নতির জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা অনুসরণ করা। তারা তাদের যুক্তির সমর্থনে এরূপ দলিল পেশ করে যে, ইমাম গায্‌যালী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইহইয়া উলুমদ্দীন' কে চারখণ্ডে বিন্যস্ত করেছেন এবং নামায, রোযা ও অন্যান্য ই'বাদতের অংশ (যা ফিকাহের আলোচ্য বিষয়), তা মুনজিয়াত[৫৪] নামীয় খণ্ডে আলাদা বর্ণনা করেছেন। এ থেকে জানা যায় যে, ইমাম গাযযালী (রহ.) 'হুকামা' বা জ্ঞানী গুণীদের সংগে এ ব্যাপারে একমত যে, 'ইবাদতে বদনীয়া' বা শারীরিক ইবাদত যেমন তাঁর (গায্‌যালী (রহ.) নিকট নাজাত দানকারী নয়, তদ্রূপ তা হুকামাদের দৃষ্টিতেও মুক্তি প্রদানকারী নয়।

তারা আরো যুক্তি প্রদান করে যে, যার কাছে নবীগণের দাওয়াত পৌঁছে কিন্তু সময়ের দূরত্ব এবং নিদর্শনাবলী ও মু'জিযা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে সে

---

৫৩ শাহানশাহ আকবরের জন্য।

৫৪ নাজাতদানকারী বা মুক্তি প্রদানকারী।

নবীর নুবূওত তার জন্য গ্রহণীয় নয়। সুতরাং এর হুকুম এরূপ যে, তার জন্য সে নবীর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব নয়। যেমন পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য এরূপ হুকুম, যার কাছে নবীর দাওয়াত পৌঁছায়নি। এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা বাতুলতা বই আর কিছুই নয়।

এ যুক্তির জবাবে আমার বক্তব্য হলো : আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম আল্লাহর নির্দেশে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন, যাতে তাঁরা মানবিক গুণের পরিপূর্ণতা বিধান করতে পারেন ও অন্তরের (কল্‌বের) ব্যাধির চিকিৎসা করেন। আর এ কাজটি নাফরমানদের ভীতি প্রদর্শন এবং ফরমাবরদারদের খোশ্ খবর দেওয়া ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তাছাড়া তাঁরা আখিরাতে আযাব ও ছওয়াবের খবর প্রদানকারীও। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার কুপ্রবৃত্তির প্রাধান্য আছে, যা তাকে গুনাহ ও খারাপ কাজের দিকে আকর্ষণ করে এবং তারা একেই দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর বলে মনে করে। অথচ আখিরাতের নাজাত ও মুক্তি এবং চিরস্থায়ী কল্যাণ 'বি'ছাত' বা নবী প্রেরণের সংগে সম্পৃক্ত। কেননা, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। পক্ষান্তরে, 'হুকামা' বা জ্ঞানী-গুণীরা যখন তাঁদের বাতিল মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে, তখন তারা নিজেদের বক্তব্যের সাথে ঐ সমস্ত বিষয়কে সংযুক্ত করে দেয়, যা তারা নবীদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব এবং তাঁদের কথাবার্তা, এমনকি তাঁদের পূর্ণ অনুসারীদের কথাবার্তা থেকে চুরি করে নেয়, এবং তা নিজেদের বক্তব্য বলে চালিয়ে দেয়; যেমন চরিত্র গঠন সম্পর্কে কিছু বর্ণনা এবং ঐ ধরনের নেক্-কাজের কিছু বয়ান-যা বাতিন বা গোপন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। তারা এসবকে একটি বিশেষ বিষয় হিসেবে সংকলিত করেছে-(যার নাম হলো 'দর্শন শাস্ত্র') যা তোমাদের মাঝে বিদ্যমান আছে।

বস্তুত হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহ.) তো ঐ সমস্তকে কেবল ইবাদাতের অংশ এজন্য নির্ধারণ করেছেন যে, ফকীহগণ এ সমস্তকে তাদের ফিকাহর কিতাবে অনুষংগী বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং যেভাবে বর্ণনা করা উচিত ছিল, সেভাবে বর্ণনা করেননি। কেননা, তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো 'প্রকাশ্য আমল' এবং তারা জাহের বা প্রকাশ্যের উপর হুকুম দেয়, 'কুলুব' বা বাতিনের ব্যাপারে তারা কিছু বলেন না। বরং এ ব্যাপারে বর্ণনা করেন তরীকতের আলিমগণ এবং আল্লাহর পথের পথিক বা সালিকগণ। এজন্য ইমাম গায্যালী (রহ.) ঐ 'শরীয়ত' যা জাহিরের (প্রকাশ্যের) সাথে সংযুক্ত-একত্রিত করেছেন এবং স্বীয় গ্রন্থকে এ ধারণা অনুসারে বিভক্ত করে এ অংশের নাম দিয়েছেন 'মুনাজ্জী' বা মুক্তি দানকারী। যদিও ইবাদাতের ক্ষেত্রেও তিনি বলেছেন যে, 'তাও নাজাত প্রদানকারী। কেননা, 'ইবাদাত করার কারণে নাজাত

বা মুক্তি পাওয়ার কথা, ফিকাহের মাধ্যমে জানা যায়; কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের নাজাতের কথা তা থেকে জানা যায় না।

সুতরাং চিন্তা কর। এখনও যদি তোমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকে, তবে এই গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি অনুধাবন কর, যা আমি আলোচনা করেছি। হয়তো তোমাদের সমস্ত সন্দেহ এতে নিরসন হবে। তর্কের খাতিরে আমি আরো বলছি : তোমরা তো 'জালিয়ানুস্' ও 'সীবুয়াকে' দেখনি। বল দেখি, তোমরা কিরূপে জানলে যে, তিনি একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক ছিলেন এবং 'সীবুয়া' ছিলেন একজন প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ? যদি তুমি জবাবে বল যে, আমি চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করেছি এবং তাঁর লেখা গ্রন্থরাজী পাঠ করেছি; ফলে জানতে পেরেছি যে, তিনি রোগের চিকিৎসা এবং অসুখ দূর করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। আর এভাবেই আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। এভাবেই আমি ব্যাকরণের জ্ঞান হাসিল করেছি 'সীবুয়ার' গ্রন্থরাজী থেকে, তাই নিশ্চিত জেনেছি যে, তিনি ছিলেন একজন ব্যাকরণবিদ।

এরূপেই আমি বলতে চাই যে, যখন তুমি নুবূওতের অর্থ জানতে চাইবে তখন কোরআন ও হাদীসের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করবে; তখন তুমি অবশ্যই জানতে পারবে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুবূওতের সর্বোত্তম মর্যাদায় বিভূষিত এবং সময়ের দূরত্বের কারণে এ সত্য প্রত্যায়নে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি। কেননা, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত কথাবার্তা, ক্রিয়াকর্ম, নেক্-আমল ইত্যাদি মানবতার পূর্ণতার সংবাদ প্রদান করে এবং রোগগ্রস্ত দিলের (অন্তরের) চিকিৎসা এবং তার মলিনতা বিদূরণের প্রক্রিয়ার খবর দেয়। বস্তুত নুবূওতের অর্থ এছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন অবশিষ্ট রইলো পাহাড়ের চূড়ায় বসবাসকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের বিষয়টি, যাদের কাছে নবীর দাওয়াত পৌঁছায়নি। আর তারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাও শোনেনি এবং তাঁর অবস্থা সম্পর্কেও কিছু জানতে পারেনি। এমতাবস্থায়, তাদের জন্য তাঁর (সা.) উপর ঈমান আনা সম্ভব নয় এবং তিনি যে, প্রেরিত রাসূল ছিলেন-সে জ্ঞান থাকাও তাদের জন্য সহজ নয়। ব্যাপারটি এমন, যেন তাদের কাছে কোন নবী রাসূল আসেননি, তাই তারা মা'যুর (ওযর প্রাপ্ত) হবে; ফলে, তাদের জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা কার্যতঃ সম্ভব নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

অর্থাৎ "আমি আযাব প্রদান করি না, যতক্ষণ না আমি কোন রাসূল প্রেরণ করি"।[৫৫]

অবশেষে আমার হৃদয়ে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, আমি তাদের কাছে এমন বক্তব্য পেশ করবো, যাতে তাদের সন্দেহের নিরসন হয় এবং এমন কিছু লিখবো, যা তাদের বিভ্রান্তি দূর করে। কেননা, আমি অনুভব করি যে, আমার উপর এক বিরাট দায়িত্ব আছে এবং আছে এক অবশ্যম্ভাবী 'করয' বা দেনা, যা আদায় করা ব্যতীত নিস্তার নেই-তখন আমি নুবূওতের আসল উদ্দেশ্য কি, তা বিধৃত করে এ পুস্তিকাটি লিপিবদ্ধ করি। এতে আমি খাতেমুর-রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবূওত ও রিসালাতের বাস্তবতা সঠিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং তাঁর নুবূওত ও রিসালাত অস্বীকারকারীদের সন্দেহ অপনোদন করেছি। ভূঁয়ো দর্শন শাস্ত্রের সমালোচনা এবং সে জ্ঞানের চর্চা ও সে সম্পর্কিত পুস্তকাদি পাঠে যে ক্ষতি হয়, তা বর্ণনার উদ্দেশ্যে প্রকৃষ্ট দলীলসহ এ গ্রন্থ রচনা করেছি। এ বিষয়গুলি আমার ব্যথাতুর হৃদয়ে, মহা-প্রতাপশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে আমি বলছি যে, এ পুস্তকটি একটি ভূমিকা ও দু'টি নিবন্ধে রচিত হলো। আর 'মুকাদ্দামা' বা ভূমিকায় আছে দু'টি অধ্যায়।

নুবূওতের আসল অর্থ কি?

জেনে রাখ, কালামশাস্ত্রবিদদের নিকট তিনি-ই নবী, যিনি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এরূপ নির্দেশ প্রাপ্ত হন যে, "আমি তোমাকে অমুক কাওমের নিকট অথবা সমস্ত লোকের নিকট প্রেরণ করেছি"। অথবা-"তুমি এ বার্তা আমার তরফ থেকে তাদের কাছে পৌছে দাও"। কিম্বা এ ধরনের বাক্য হবে, যা এরূপ অর্থের সমার্থক হবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, "আমি তোমাকে তাদের নিকট প্রেরণ করেছি, "অথবা তাদেরকে এ খবর দিয়ে যাও"।

এই ধরনের প্রেরণের মাঝে কোন শর্ত আরোপিত হয়নি এবং প্রেরিত ব্যক্তির শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারেও কোনরূপ শর্ত আরোপ করা হয়নি-এটাই 'হুকামা' বা জ্ঞানী-গুণীদের অভিমত। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ যাকে চান, তাঁকে স্বীয় রহমতের সাথে খাস করে নেন। আর আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে, তাঁর পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব তিনি কাকে অর্পণ করবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা 'কাদেরে মতলাক' বা সমস্ত ক্ষমতার উৎস, তিনি যা চান তাই করেন এবং যা ইচ্ছা করেন, তা সম্পন্ন করেন।

---

[৫৫] আল-কোরআন, ১৭ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ১৫

আমার অভিমত হলো : কালাম শাস্ত্রবিদরা নবীর জন্য মু'জিযার অধিকারী হওয়াকে শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন-এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। আর না তারা নবীর জন্য মু'জিযার অধিকারী হওয়াকে তাঁর বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছেন, যাতে অন্যদের থেকে তাঁরা অধিক সম্মানিত হতে পারেন। আর তা এজন্যে যে, তাদের নিকট মু'জিযা নবী হওয়ার জ্ঞানের জন্য শর্ত স্বরূপ, নবী হওয়ার জন্য নয়। আর বিশেষ সম্মান বা মর্যাদার অর্থ-জ্ঞানের মর্যাদা বিশিষ্ট, ব্যক্তির মর্যাদার অর্থ নয়।

পক্ষান্তরে, এ ব্যাপারে দার্শনিকদের অভিমত হলো : তিনি-ই নবী, যাঁর মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটবে, যার ফলে তিনি অন্যদের থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হবে-যিনি নবী হবেন তিনি বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞানে জ্ঞানী হবেন। এ ব্যাপারে আমার অভিমত হলো-আমরা এবং তোমরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, নবীদের জন্য এ ওয়াজিব নয় যে, তাঁরা সমস্ত অদৃশ্য জগতের বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবেন। তবে কিছু বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ব্যাপারটি কেবল নবীদের জন্য খাস নয়, বরং তা সুফী, সাধক, আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, এমনকি স্বপ্নযোগে নিদ্রিত ব্যক্তিও জানতে পারে। সুতরাং এ পর্যায়ে কোনরূপ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তাঁরা হতে পারেন না। আমার মতে, তাদের এরূপ বক্তব্যের অর্থ হলো, নবীগণ অধিকাংশ গায়েবের বিষয় সম্পর্কে অবহিত, তবে তা স্বভাবগত জ্ঞানের কারণে নয়, বরং অস্বাভাবিকভাবে। আর এরূপ কিছু হওয়া অবাস্তব নয়, বরং তা আগে থেকে প্রচলিত আছে এবং সংঘটিত হয়ে আসছে।

এখন বাকী রইল, যদি কেউ দু' একবার গায়ের সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সে তা প্রকাশও করে দেয়, কিন্তু তা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হয় না, তবে এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরূপ কিছু হলে-নবী, গায়ের নবী[৫৬] থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন।

জেনে রাখ, মুতাকাল্লেমীন বা কালাম শাস্ত্রবিদগণও একথা স্বীকার করেন যে, আম্বীয়া আলাইহিমুস্ সালামগণ, আল্লাহ তা'আলা জানানোর ফলে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন। কিন্তু এরূপ শর্ত নির্ধারণ করা সঠিক নয়। এভাবে, ঐ কারণও রদ যোগ্য, যা দার্শনিকগণ গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য বর্ণনা করেছেন। কেননা, এটি আহলে-ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে সুসম্পর্কিত নয়।

---

৫৬ 'গায়ের-নবী' অর্থাৎ যিনি নবী নন, এরূপ ব্যক্তি।

একটি বিষয়ের আলোচনা অবশিষ্ট রইলো এবং তা হলো : উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, অন্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা, এটি ঐ সমস্ত 'আ'জীব' বা আশ্চর্যজনক বিষয়ের মধ্যে শামিল-যা অভ্যাসের বিপরীত। বস্তুত এ সম্পর্কে আলাদা বর্ণনা করার তেমন কোন প্রয়োজন নেই।

২. দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো : নবী থেকে এমন কর্মকাণ্ড প্রকাশ পাবে, যা অস্বাভাবিক। আর তা এজন্য যে, সৃষ্ট-জগতের মূল সত্ত্বা তাঁর অনুসারী এবং তাঁর নির্দেশের অনুগামী; যেমন-শরীর নাফসের অনুসারী। বস্তুত এরূপ হওয়া অবাঞ্ছিত নয় যে, নবীর নাফ্স এত শক্তিশালী যে, সে নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োগ শক্তির দ্বারা সৃষ্ট জগতের বিধানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এমনকি তাঁর ইচ্ছার কারণে যমীনের বুকে হাওয়া প্রবাহিত হতে পারে, ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হতে পারে, বন্যা বা সয়লার আসতে পারে, যালিমরা ধ্বংস হতে পারে এবং পাপীদের শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে। আমি বলবো, শরীর-স্থিত নাফ্সের প্রভাবে এরূপ হতে পারে। এ ব্যাপারে আগে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ-ই কিছু করতে সক্ষম নন। বস্ততঃ অস্বাভাবিক, আশ্চর্যজনক কোন ঘটনা প্রকাশ পাওয়া নবীর সাথে সম্পৃক্ত নয়, যেমন তোমরা তা স্বীকার কর।

এমতাবস্থায়, নবী এবং গায়ের নবীর মধ্যে আমরা কিরূপে পার্থক্য নির্ধারণ করবো?

আমার মতে, দার্শনিকগণ যদিও 'গায়ের-আম্বীয়া'[৫৭] থেকে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাওয়াকে জায়েয বলেন, কিন্তু তারা বার বার সংঘটিত হতে পারে তা মনে করেন না; যেমন পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়। এ পর্যায়ে নবী ও গায়ের-নবীর মাঝে পার্থক্য সূচিত করা খুবই সহজ। কেননা, তিনি-ই নবী, যাঁর থেকে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কর্ম-কাণ্ড প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, যারা নবী নন, তাদের থেকে এরূপ কিছু সংঘটিত হয়না। আল্লাহ তায়ালা 'হাকীকতে হাল' বা বাস্তব-অবস্থা সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফ্হাল।

৩. তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো : নবী ফিরিশ্তাদের বিশেষ সুরতে দর্শন করবে এবং তাদের কথাবার্তা শ্রবণ করবে যখন আল্লাহর কালাম বা ওহী নিয়ে তারা আসবে। আমি বলবো : এরূপ উক্তি দার্শনিকদের মাযহাব ও বিশ্বাসের অনুরূপ নয়। কেননা, তারা এরূপ বলে না যে, ফিরিশ্তাদের খালি চোখে দেখা যায়।

---

[৫৭] 'গায়ের-আম্বীয়া' অর্থাৎ যারা নবী নন এরূপ ব্যক্তি।

বরং তাদের দৃষ্টিতে ফিরিশ্‌তা হলো এমন সৃষ্টি, যা যাতের দিক দিয়ে সূক্ষ্ম এবং সৃষ্টি জগতের পরিচালনার সংগে সম্পর্কিত এবং এদেরকে "মালায়েকা-ই-সামাবীয়া" বা "আসমানের ফিরিশ্‌তা" বলা হয়ে থাকে। অথবা যাত ও কর্মের দিক দিয়ে তারা জ্ঞান-সম্ভুত এবং এদেরকে "মালা-ই 'আলা' বা উর্দ্ধ-জগতের ফিরিশ্‌তা বলা হয়। আর এদের এমন কোন কথা নেই যা শোনা যেতে পারে; কেননা, তা জড় দেহের সাথে সম্পর্কিত। এ কারণে, বর্ণ ও ধ্বনি তাদের কাছে তাই, যা সংমিশ্রিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে।

আমার অভিমত হলো : দার্শনিকগণ সম্ভবত সূক্ষ্ম বস্তু দৃষ্টিগোচর হওয়া এবং তার কথাবার্তা শোনাকে তখন সম্ভব বলে মনে করেছে, যখন তা কোন আকার-আকৃতি সম্ভুত হবে না। যেহেতু এটি বৈধ যে, যদি তা আকার-আকৃতির সাথে প্রতিভাত হয় এবং শরীরের সাথে প্রকাশিত হয়, তখন দেখার সম্পর্ক তো তার সাথে হবেই এবং তার কথা শোনাও সম্ভব হবে। কেননা, প্রত্যেক অবস্থার জন্য, জায়েয ও না-জায়েয হওয়ার দিক দিয়ে হুকুম আলাদা। তাই, তাঁরা যখন তাদের উচ্চ কর্তব্য ও মর্যাদা থেকে নেমে আসে এবং অবতরণের পোশাক পরিধান করে, তখন তাঁরা এখানকার বিধি-বিধান এখ্‌তিয়ার করে এবং এতে কোনরূপ বাধা বিপত্তি নেই। অতএব গভীরভাবে অনুধাবন কর। আল্লাহ, পবিত্র মহান, এ ব্যাপারে অধিক অবহিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মু'জিযা সম্পর্কে

আমাদের নিকট মু'জিযা হলো ঐ জিনিস, যদ্বারা ঐ ব্যক্তির প্রত্যয়ন করা মাকুসদ হয় যে দাবী করে যে, "সে আল্লাহর রাসূল"। এর জন্য কয়েকটি শর্ত আছে ১. মু'জিযা হবে আল্লাহর কাজ; কেননা, সত্যতা প্রতিপাদন তখনই সম্ভব হবে, যখন তাঁর তরফ থেকে তা সম্পাদিত হবে; ২. মু'জিযা হবে আলৌকিক ও অস্বাভাবিক কোন কাজ। কেননা, যে সমস্ত কাজ নিয়ম মাফিক, রুটিন অনুযায়ী সম্পাদিত হয়; যেমন প্রত্যহের সূর্যোদয়, প্রতি বসন্তে ফুলের সমারোহ-এইগুলি সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য দলীল নয়, যেমন তুমি নিজেই বুঝতে পার; ৩. মু'জিয়া প্রতিহত করা সম্ভব নয়, কেননা অলৌকিকত্বের মূল স্বরূপ হলো এরূপ; ৪. মু'জিযা নুবূওত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে, যাতে জানা যায় যে, এটাই তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী; ৫. মু'জিযা-দাবীর অনুরূপ হতে হবে। বস্তুত কেউ যদি বলে : "আমার মু'জিযা হলো, আমি মৃতকে জীবিত করি"। কিন্তু তাঁর থেকে যদি এছাড়া অন্য কোন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, যেমন পাহাড় ঝুলিয়ে রাখা, এমতাবস্থায় এ তাঁর জন্য সত্যতা প্রদানকারী হবে না। কেননা, তাঁর এ প্রত্যয়ন আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়নি; ৬. মু'জিযার দাবীদার ব্যক্তি যখন মু'জিযা হিসাবে কোন কিছু পেশ করে, তখন তা যেন তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে। যেমন যদি কেউ দাবী করে যে, আমার মু'জিযা হলো : গুইসাপ কথা বলবে। কিন্তু সেই গুইসাপ কথা বলার সময় বললো যে, "সে মিথ্যাবাদী"। তখন তার দাবী সত্য বলে প্রমাণিত হবে না, বরং সে যে মিথ্যাবাদী তা চরমভাবে প্রতিপন্ন হবে কেননা, তার অলৌকিক ক্ষমতা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো ৭. নুবূওতের দাবীর পূর্বে যা সংঘটিত হয় তা মু'জিযা নয়; কেননা, নুবূওয়ত দাবীর পূর্বে তা প্রত্যয়ন করার ব্যাপারটি বোধগম্য নয়। এ কারণে হযরত ঈ'সা আলাইহিস্ সালামের দোলনায় কথা বলা, শুষ্ক বা মৃত খেজুর গাছ থেকে তাজা খেজুর পতিত হওয়া, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীনা মোবারক বিদীর্ণ করা এবং তাঁর কল্‌ব বা আত্মা ধৌত করা, তাঁর উপর মেঘের ছায়াদান করা; পাথর ও টিলায় তাঁকে সালাম দেওয়া এসব এমনই ব্যাপার, যা তাঁর নুবূওত প্রাপ্তির আগে সংঘটিত হয়। কাজেই এগুলি মু'জিযা নয়; বরং এগুলি কারামত। এমতাবস্থায় এগুলোকে নুবূওতের ভিত্তিমূল বলা যেতে পারে।

পক্ষান্তরে, যে সব মু'জিযা দাবীর পরে অনুষ্ঠিত হয়, অথবা তা এত পরে সংঘটিত হয় যে, তা স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হতে ঐরূপ সময় লাগে; এমতাবস্থায়, এ স্পষ্ট যে, এটি তাঁর সত্যবাদী হওয়ার দলীল। কিন্তু যদি সে মু'জিযা সংঘটিত হতে বেশী সময় লাগে; যেমন-এরূপ বলা যে, আমার মু'জিযা হলো, অমুক জিনিস এক মাসের মধ্যে প্রকাশ পাবে, আর তা সেভাবেই সংঘটিত হলো। এমতাবস্থায় সকলে একমত যে, এটিও মু'জিযা এবং তা নুবূওতের জন্য স্পষ্ট দলীল। তবে তা অনুসরণের জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না সে দাবীকৃত মু'জিযা অনুষ্ঠিত হয়। কেননা, তার জন্য এটি শর্ত যে, সে জানবে তার মু'জিযার ব্যাপারটি। আর সেটি তখন প্রকাশ পেয়ে যাবে, যখন তা সংঘটিত হবে, যার ওয়াদা সে করেছিল।

এখন অবশিষ্ট রইলো, নুবূওতের দাবীদার সত্য হওয়ার উপর মু'জিযার ব্যাপারটি। তাঁর সম্বন্ধে জানতে হবে যে, তাঁর এ ব্যাপারটি কেবল জ্ঞান সম্ভূত নয়, বরং তা বাস্তব। যেমন-কর্মের ব্যাপারটি নির্ভর করে কর্ম-সম্পাদনকারীর উপর। আর কার্যটি কতখানি বাস্তব ও সঠিক তা নির্ভর করে তার উপর যার দ্বারা সেটি সম্পন্ন হয় এবং সে তা জানেও। কেননা, জ্ঞান সম্ভূত দলীল, তার মাদ্‌লুলের সাথে সম্পৃক্ত। আর এরূপ ধারণা করা সঠিক হবে না যে, এর থেকেও ব্যাপারটি বুঝা যায় না। বস্তুত মু'জিযা এরূপ নয়; কেননা, আসমানের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া, নক্ষত্র রাজীর কক্ষচ্যুত হওয়া, পাহাড়ের টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়া, দুনিয়ার শেষ জীবনে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া ইত্যাদি এবং এ সময় কোন প্রেরিত পুরুষ থাকবে না। একইভাবে, আওলিয়াদের মাধ্যমে কারামত প্রকাশ পায়। তবে নবীদের জন্য তাঁর নুবূওতের দাবী, তাঁর সত্যবাদিতা প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত জরুরী। কেননা, এ সত্যটি নবীর সত্যবাদী হওয়ার উপর নির্ভরশীল। সাইয়েদ সনদ (রহ.) 'শরহে মাত্তাকিফে' এরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁরই তরফ থেকে তাওফীক আসে। আমি বলবো : চ্যালেঞ্জ এবং মুকাবিলার প্রকাশ্য আহবান, যদিও 'জম্‌হুর' বা অধিকাংশ আলেমের মতে মু'জিযার জন্য শর্ত নয়, তবুও সাধারণভাবে অবস্থার প্রেক্ষিতে যা বুঝা যায় তা হলো : চ্যালেঞ্জ সেই সমস্ত ব্যাপারে করা হয়েছে, যা মু'জিযা হিসাবে সবার জন্য প্রয়োজন এবং তা ব্যতীত সেটি মু'জিযা হতে পারে না। পক্ষান্তরে, এমন বিষয়ের খবর-যা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার সময় সংঘটিত হবে অথবা কিয়ামত কায়েম হওয়ার সময় অনুষ্ঠিত হবে-তা মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, এসব ব্যাপারে আদৌ কোন চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়নি। প্রকাশ্যতঃ এরূপ না হওয়ার কারণ তো স্পষ্ট। পরোক্ষভাবেও

স্পষ্ট যে, সে সময় এমন কেউ-ই অবশিষ্ট থাকবে না, যাকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। এমনিভাবে ঐ সমস্ত কারামত যা আওলিয়াদের মারফত প্রকাশ পায়, তাও মু'জিযা নয়। কেননা, সেখানে না আছে কোন মুকাবিলার আহ্বান, আর না কোন চ্যালেঞ্জ। সুতরাং নুবূওতের দাবীদারের সত্যতার উপর, এই সমস্ত অলৌকিক বিষয়কে প্রাধান্য না দেওয়ার কারণে, মু'জিযার বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য ক্ষুন্ন হতে পারে না। এটিই তাৎপর্য, অনুধাবন কর। এক্ষণে, যদি তুমি বল যে, নুবূওতের দাবীদারের সত্যতার উপর মু'জিযার প্রাধান্য এজন্যে যে, তা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক এবং তাতে মু'জিযার বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। এর জবাবে আমি বলবো : ব্যাপারটি সেরূপ নয়, যেরূপ তুমি ধারণা করেছ। বরং মুকাবিলা করতে অপারগ হওয়া এবং অন্যদের তার অনুরূপ কিছু পেশ করার ক্ষমতা না থাকাই-মু'জিযার হাকীকত, বাস্তবতা। এটিই নুবূওতের দাবীদারের সত্যতা প্রমাণ করে। সুতরাং জানা গেল যে, নবীর নুবূওতের জন্য মু'জিযা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য বিষয়।

আর এরূপ বলা সংগত হবে না যে, সাইয়েদ সনদ শরীফ 'শরহে মাত্তাকিফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, কেবল নক্লী দলীল যথেষ্ট নয়, কেননা খবর দাতার সত্যবাদী হওয়াও জরুরী এবং এটা 'আকল' বা জ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর ব্যাপার হলো : মু'জিযা, যা সত্য প্রতিষ্ঠাকারী, যদি এর প্রতি লক্ষ্য করা যায় তবে বুঝা যাবে যে, নবী সত্যবাদী হওয়ার উপর মু'জিযা নির্ভরশীল এবং এটি 'আকল' বা জ্ঞান সম্মত দলীল। একথাটির অর্থ হলো : সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মু'জিযার উপরে জ্ঞানের-পর্যায়ে লক্ষ্য করতে হবে, যাতে জানা যায় যে, খবরদাতা অর্থাৎ নবী সত্যবাদী।

একইরূপে বলা যায় যে, নবীর সত্যবাদী হওয়ার উপর মু'জিযা নির্ভরশীল এবং এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কেননা, আল্লাহ তা'আলার অভ্যাস এই যে, মু'জিযা প্রকাশ হওয়ার পর তিনি সত্যবাদী হওয়ার ইলম্ বা জ্ঞান সৃষ্টি করে দেন। কেননা, মিথ্যাবাদী থেকে মু'জিযা প্রকাশ করা জ্ঞানের দিক থেকেও যদিও সম্ভব, কিন্তু তা 'আদত' বা বাস্তবতার খেলাফ। কেননা যে ব্যক্তি বলে যে, আমি নবী, পরে পাহাড় সাথে নিয়ে আসে এবং লোকদের মাথার উপর তা লটকিয়ে দিয়ে বলে : যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত কর, তবে তা তোমাদের উপর আপতিত হবে; আর যদি তোমরা আমাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার কর, তবে এ তোমাদের থেকে দূরে সরে যাবে। আর লোকেরা যখন তাকে সত্যবাদী বলে ধারণা করে, তখন সে পাহাড় তাদের থেকে দূরে সরে যায়। পক্ষান্তরে, লোকেরা যখন তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করে, তখন সে পাহাড় তাদের

নিকটবর্তী হয়। এ থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, সে তাঁর দাবীতে সত্যবাদী ছিল। আর বাস্তবতার নিরিখে জানা যায় যে, মিথ্যাবাদী থেকে এ ধরনের ব্যাপার প্রকাশ পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

আর লোকেরা এর জন্য একটি উদাহরণ বর্ণনা করেছেন, যেমন-কোন ব্যক্তি যদি অনেক লোকের উপস্থিতিতে এরূপ দাবী করে যে, আমি এই বাদশাহর তরফ থেকে তোমাদের কাছ দূত হিসেবে আগমন করেছি। অতঃপর সে বাদশাহকে বলে : যদি আমি সত্যবাদী হই, তবে আপনি আপনার অভ্যাসের খেলাফ করুন এবং নিজের আসল জায়গা সিংহাসন পরিত্যাগ করে ঐ স্থানে উপবেশন করুন, যেখানে বসতে আপনি অভ্যস্ত নন। তখন বাদশাহ যদি এরূপই করে, তবে ঐ ব্যক্তির বক্তব্য সত্য বলে বাস্তবায়িত হবে এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে কেউ এ ব্যাপারে সন্দিহান হবে না। ব্যাপারটি এমন নয় যে, গায়েব বা অদৃশ্যকে হাযির বা উপস্থিতের উপর ধারণা করা হয়েছে। বস্তুতঃ আমাদের বক্তব্য হলো : মু'জিযা প্রকাশ পাওয়ায়, নবীর সত্যবাদী হওয়া বুঝা যায়।

ব্যাপারটি বোধগম্য করার জন্য আলোচনাটি আরো দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে। যেমন-মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে : মিথ্যাবাদীর দ্বারা মু'জিযা প্রকাশ করতে আল্লাহ তা'আলা সক্ষম। কেননা, তিনি সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। কিন্তু এরূপ হওয়া তাঁর হিক্মতের দিক দিয়ে সিদ্ধ নয়। কেননা, এমতাবস্থায় তার সত্যবাদী হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়, যা বিভ্রান্তিকর। তাই, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে মিথ্যাবাদীর দ্বারা মু'জিযা প্রকাশ পাওয়া আদৌ সংগত নয়।

শায়েখ এবং আমাদের কোন সাথী বলেন : মিথ্যাবাদীর দ্বারা মু'জিযা প্রকাশ করা আদৌ আল্লাহর ইচ্ছা নয়। কেননা, মু'জিযা তো সত্য প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। কাজেই, সত্যবিরোধী সব কিছুই পরিত্যজ্য। বস্তুতঃ মু'জিযা সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করে দেয়। পক্ষান্তরে, ঐ মু'জিযা-যা মিথ্যাবাদীর দ্বারা প্রকাশ পায় এবং তা সত্য প্রতিষ্ঠিত করে, তখন মিথ্যাবাদী সত্যবাদী হয়ে যাবে এবং তা অসম্ভব। অন্যথায় মু'জিযা ঐ বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, যা তার জন্য একান্ত প্রয়োজন। আর এরূপ হওয়াও অসম্ভব, অবাস্তব।

আর কাযী বলেছেন যে, মু'জিযা প্রকাশ পাওয়াকে নবীর সত্যবাদীতার সাথে সম্পৃক্ত করা কোন জরুরী ব্যাপার নয়; বরং কাজের অস্তিত্ব যেমন কর্মীর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, তদ্রূপ ওটি একটি অভ্যাসগত ব্যাপার, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বস্তুত, আমরা যদি তার আসল স্থান থেকে সরিয়ে আনাকে জায়েয বা বৈধ মনে করি, তবে মু'জিযা যে সত্য নয়-এরূপ ধারণা করা সঠিক

৩–

হবে। এমতাবস্থায় মিথ্যাবাদী থেকে তা প্রকাশ পাওয়াও বৈধ হবে। এতে কোন জটিলতা বা মতানৈক্য নেই যে, মু'জিযাতে অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারটি প্রকাশ পায়, আর এরূপ হওয়াই উচিত। সুতরাং বলা যায় যে, মিথ্যাবাদী দ্বারা মু'জিযা প্রকাশ পাওয়া বৈধ নয়; কেননা, মিথ্যাবাদীর সত্যবাদী হওয়া আদতেই সম্ভব নয়।

আমি বলতে চাই, যদি আসল জিনিসকে তার আসল অবস্থান থেকে সরিয়ে নেওয়াকে বৈধ মনে করা হয়, তবে মু'জিযাকে-নবীর সত্যবাদী হওয়ার বিশ্বাস থেকে খালি করাও বৈধ। কেননা, তাঁর সত্যতার ইল্‌ম বা জ্ঞান মু'জিযার পর প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় সত্যবাদীর পার্থক্য-মিথ্যাবাদী থেকে হতে পারে না; এবং 'ইছবাতে নুবূওত' বা 'নুবূওতের প্রতিষ্ঠার' দরওয়াজা বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, এটি প্রতিষ্ঠার জন্য এর উপর বিশ্বাস করতে হয় যে, মু'জিযা প্রকাশের সময়, নবীর সত্যবাদী হওয়ার 'ইলম্' (বা জ্ঞান) অবশ্যই হাসিল হবে, বরং তা খুবই জরুরী। অন্যথায়, মু'জিযা আর মু'জিযা থাকবে না। কেননা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক হওয়ার কারণে একে মু'জিযা বলা হয় এবং তা সত্যবাদীতার উপর নির্ভরশীল।

পক্ষান্তরে, যদি আমরা কেবলমাত্র অস্বাভাবিক ব্যাপারকে বৈধ বলে স্বীকার করি এবং সততা ও সত্যবাদীতাকে অগ্রাহ্য করি; এমতাবস্থায়, ব্যাপারটি 'উমুরে আদিয়া' বা অভ্যাসগত ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন-আমরা প্রত্যহ পূর্বের আকাশে সূর্যোদয় হতে দেখি এবং পশ্চিমাকাশে তা অস্ত যেতে দেখি। কাজেই, আসল ও বাস্তব কথা যা আমি বর্ণনা করেছি, তা হলো : আমি অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারকে কেবলমাত্র 'মু'জিযা' হিসাবে নবীদের জন্য এবং 'কারামত' হিসাবে ওলীদের জন্য জায়েয মনে করি। কেননা, প্রতি যুগে-যুগে এ সংঘটিত হয়েছে, এমনকি এ 'আদতে-মুস্‌তামাররা' বা 'চলমান-অভ্যাসের' রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ সত্য অস্বীকার করা আদৌ সম্ভব নয়।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় দেখা যায় যে, 'আদত বা অভ্যাস স্বীয় অবস্থার উপর বিদ্যমান থাকে, কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তিত হয় না। তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না এবং তাতে অলৌকিকত্বও কখনও জায়েয বা বৈধ নয়, অন্যথায় এ অবশ্যম্ভাবী হবে যে, ঐ পাহাড়-যাকে আমরা আগে দেখেছি, তা সোনায় পরিণত হয়ে যাওয়া জায়েয বলতে হবে। এভাবে সমুদ্রের পানি-রক্ত বা তেলে পরিণত হওয়া, ঘরের আসবাবপত্র মৃত 'আলমের রূপ পরিগ্রহ করা-জায়েয হয়ে যাবে, অথবা এমনও হওয়া বৈধ মনে করতে হবে যে, বৃদ্ধ ব্যক্তি বাপ-মা ছাড়াই হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়লো।

আর এমন যদি হয়, যার থেকে মু'জিযা বা আলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ পায় অথচ সে নুবূওতের দাবীদার নয়, অর্থাৎ নবী নয়; তার দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে-কর্মে অকল্যাণ ও অমঙ্গল ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না; যা কোন গোপন ব্যাপার নয়।

বস্তুত, আল্লাহ সুব্হানুহু ওয়া তা'আলা যদি মিথ্যাবাদীদের দ্বারা মু'জিযা প্রকাশ করে দেন, তবুও ঐ মু'জিযার দ্বারা সেই ব্যক্তির সত্যবাদী হয়ে যাওয়ার বিশ্বাস-আদৌ সম্ভব নয়। কেননা, মিথ্যাবাদীর সত্যবাদী হয়ে যাওয়া অসম্ভব, অবাস্তব। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর তরফ থেকে মু'জিযা প্রকাশ পাওয়ার উদ্দেশ্য হলো-মিথ্যাবাদীদের প্রত্যয়ন করা। আর মিথ্যাবাদীদের প্রত্যয়ন করা হলো মিথ্যা বলা। যেমন কোরআন মজীদে উল্লেখ আছে :

سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا.

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা তা থেকে মহান ও পবিত্র, যা তারা বলে"। (১৭ : ৪৩) পক্ষান্তরে, যাদু, ভেল্কিভাজী ও তেলেসমাতী তো ঐ পর্যায়ের ব্যাপার যে, কারণ সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষিতে-তার ফল প্রকাশ পায়। অলৌকিকত্বের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে, তারা ভেল্কিবাজী ও তেলেসমাতীর মাধ্যমে এমন কিছু প্রকাশ করে, যার সাথে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন বলা যায়-এ হলো ঐ মরীচিকার মত, পিপাসার্ত পথিক যাকে দূর থেকে মনে করে পানি। কিন্তু যখন সে তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না।

প্রথম নিবন্ধ : দু'টি বক্তব্য

প্রথম বক্তব্য বি'ছাত[৫৮] ও নুবূওতের হাকীকত সম্পর্কে, গোটা মাখ্লুকাত যে তাদের মুহতাজ[৫৯]-তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। জেনে রাখ! সৃষ্টিগতভাবে মানুষের স্বভাব জ্ঞানশূন্য, খালি; তাই সে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বিভিন্ন জগৎ সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। আর সৃষ্টি জগতের সংখ্যা অসংখ্য, অনির্ণনীয়, যার জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ.

অর্থাৎ তোমার রবের লশ্করের খবর-তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।[৬০]

বস্তুতঃ তাঁর সৃষ্ট সৃষ্টি জগতের ইলম বা জ্ঞান 'ইদ্রাক' বা অনুভূতির মাধ্যমে

[৫৮] বিছাত-নবী, রাসূলের প্রেরণ ও আগমন।

[৫৯] মুহতাজ-মুখাপেক্ষী।

[৬০] আল কোরআন ৭৪ : ৩১

হাসিল হয়ে থাকে। আর অনুভূতি জাত ইন্দ্রিয়রাজীর সৃষ্টি কেবল এজন্যে হয়েছে যে, তার মাধ্যমে মানুষ 'সৃষ্ট জগত' সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। আর 'সৃষ্ট-জগতের' দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো-সব ধরনের সৃষ্টি রাজীর জগতকে বুঝানো।

উল্লেখ্য যে, মানুষের মধ্যে সর্ব-প্রথম 'স্পর্শ-অনুভূতির' সৃষ্টি হয়, যদ্বারা সে সর্দি-গর্মি, শুক্‌নো-ভিজা, নরম-শক্ত ইত্যাদি অনুভব করতে পারে। কিন্তু 'স্পর্শ-জনিত-অনুভূতির' দ্বারা রং ও শব্দকে অনুধাবন করা যায় না। বরং বলা যায় 'স্পর্শজনিত অনুভূতির' রাজ্যে এর কোন প্রবেশাধিকার নেই। অতঃপর এর মাঝে 'দর্শন-অনুভূতি' সৃষ্টি করা হয়। যদ্বারা সে রং ও আকার আকৃতি অনুমান করতে পারে। অনুভূতির-জগতে এর প্রশস্ততা অনেক ব্যাপক ও সীমাহীন। অতঃপর মানব স্বভাবের মধ্যে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করা হয়, যদ্বারা সে আওয়াজ ও গান-বাদ্য শোনে। পরে তার মাঝে 'চাখার' বা স্বাদ-গ্রহণের শক্তি সৃষ্টি করা হয়; এমনকি তা 'অনুভূত-জগৎকে' অতিক্রম করে যায়। এ সময় তাদের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়।

যখন মানব-শিশু সাত-বছর বয়সে পৌঁছে এবং এ হলো তার জীবনের ক্রম-পরিবর্তনের ধারার একটি স্তর, যদ্বারা সে ঐসব কাজ-কর্মকে বুঝতে পারে, যা অনুভূতি স্তরের বাইরে এবং 'অনুভূতির-জগতে' এর কিছুই পাওয়া যায় না। তার বয়স যখন আরো বাড়তে থাকে, তখন তার মাঝে আকল বা জ্ঞান সৃষ্টি করা হয়, যদ্বারা সে শরীয়তের বিভিন্ন স্তরের আমল যথা-ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও মুস্তাহাব ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে, যা ইতিপূর্বে কোন স্তরে হাসিল হয় না।

প্রকাশ থাকে যে, 'আক্‌ল বা জ্ঞানের উপর আরো একটি স্তর আছে, যার মধ্যে তার মাঝের আরো একটি চোখ খুলে যায়, যা দিয়ে সে অতীত ও ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত ব্যাপারাদি ও অন্যান্য কার্যাবলী অবলোকন করে-যা জ্ঞান দ্বারা হাসিল করা সম্ভব নয়। যেমন, অনুভূতি-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে 'ভাল-মন্দের' পার্থক্য নির্ণয় করা আদৌ সম্ভব নয়। একইভাবে, 'ভাল-মন্দের' পার্থক্য নির্ণয়কারী ইন্দ্রিয়ের সামনে যদি 'জ্ঞান-জাত' বিষয়কে পেশ করা হয়, তবে তো সে তা অস্বীকার করে বসবে।

বস্তুতঃ এভাবেই কিছু সংখ্যক জ্ঞানী-লোকেরা 'মুদ্‌রিকাতে-নুবূওত' বা নুবূওত প্রাপ্তির-জ্ঞানকে অস্বীকার করেছে এবং তা অবাস্তব বলে ধারণা করেছে। আর এরূপ করা চরম মূর্খতা বই আর কিছুই নয়। এরূপ করার কারণ হলো এই যে, তারা এ স্তরের সর্বোচ্চ মর্তবায় পৌঁছতে পারিনি। ফলে, তারা ধারণা

করেছে যে, এর আসলে কোন অস্তিত্ব নেই। যেমন কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি, যদি সে আদৌ রং ও আকৃতির খবর না জানে, আর তার সামনে এগুলোর গুণাগুণ যদি বর্ণনা করা হয়, তবে সে তা জানতে পারবে না এবং স্বীকারও করবে না।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাক তাঁর নবীদের স্বীয় বান্দাদের নিকটবর্তী করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে নুবূওতের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে-বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন; আর তা হলো নিদ্রা। কেননা, নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে গায়েবের এ জ্ঞান লাভ করতে পারে, যা অচিরেই ঘটবে; চাই তা স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে তা'বীরের মাধ্যমে প্রকাশিত হোক। যদি অনভিজ্ঞ কোন লোককে এরূপ বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি বেহুশ হয়ে মৃতবৎ পড়ে যায় এবং তার দেখা, শোনা ও অনুভূতির ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে যায়; এমতাবস্থায়ও সে 'গায়েব' বা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানে; তখন সে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে এবং তা অসম্ভব ও অবাস্তব বলে এরূপ দলীল পেশ করবে যে, 'স্পর্শ-শক্তি' অনুভূতির একটা অন্যতম মাধ্যম; তাই যে ব্যক্তি জীবিত থাকাবস্থায় তা অনুভব করতে পারে না, সে নিদ্রিত (বা মৃত) অবস্থায় তা কিরূপে অনুধাবন করবে? কিন্তু এটি এ ধরনের 'কিয়াস' বা ধারণা যাকে অস্তিত্ব ও দর্শন মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

উল্লেখ্য যে, 'আক্ল' বা জ্ঞান মানুষের জন্য এমন এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিনিস, যদ্বারা সে জ্ঞান সম্পর্কীয় বিভিন্ন জিনিস আয়ত্বে আনতে পারে, যা অনুভূতির মাধ্যমে হাসিল করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে, নুবূওত হলো এমন এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্তর, যাতে এমন দৃষ্টি শক্তি হাসিল হয়, যার আলোকে অদৃশ্য জগতের এমন সব খবর এবং অন্যান্য বিষয়াদি প্রকাশ পায়, যা 'আক্ল' বা জ্ঞান বুঝতে সক্ষম নয়।

আর নুবূওতের ব্যাপারে যে ধরনের সন্দেহ হতে পারে, তাহলো : ১. তার 'ইম্কান' বা সম্ভাব্যতার ব্যাপারে; ২. তার 'অজুদ' বা অস্তিত্বের ব্যাপারে এবং ৩. একজন বিশেষ ব্যক্তির তা হাসিল হওয়ার ব্যাপারে। অথচ তার অস্তিত্বই দলীল হলো-'ইম্কান' বা সম্ভাব্যের এবং এর 'অজুদ' বা অস্তিত্বের দলীল হলো-ঐ সমস্ত গোপন তথ্য ও তত্ত্ব যা জ্ঞানের দ্বারা হাসিল করার চিন্তাও করা যায় না। যেমন-চিকিৎসা শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্র; যদি কেউ এ দু'টি জ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলতে চায়, তবে প্রাথমিক পর্যায়ে তাকে এ জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে, এ দু'টি বিষয়ের জ্ঞান লাভ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে, ওহী বা ইল্হাম ব্যতীত সম্ভব নয়। কেননা, কেবল অভিজ্ঞতার দ্বারাই এ দু'টি বিষয়ের জ্ঞান লাভ আদৌ সম্ভব নয়। বস্তুত, কোন কোন নক্ষত্রের পরিক্রমা হাজার হাজার বছরে মাত্র একবার হয়ে থাকে। কাজেই, অভিজ্ঞতার দ্বারা এ জ্ঞান কিরূপে হাসিল হতে পারে?

উপরোক্ত আলোচনায় জানা গেল যে, যে সমস্ত বিষয়ের ধারণা 'আক্ল' বা জ্ঞান দ্বারা করা যায় না, তা জানার পদ্ধতির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। আর নুবূওতের জ্ঞান এরূপেই হাসিল হয়ে থাকে। এছাড়া নুবূওতের আরও কিছু খাস বৈশিষ্ট্য আছে। আর আমি যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলাম, তা মহাসমুদ্রের ক্ষুদ্র বারি বিন্দুর মত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলগণের যে মু'জিযা বা অলৌকিক শক্তি প্রদান করেছেন, জ্ঞানীরা তাদের জ্ঞান দ্বারা কখনো ঐ স্তরে পৌঁছাতে পারে না। মু'জিযা ব্যতীত নুবূওতের আর যে সব বৈশিষ্ট্য আছে, তার ধারণা আমরা 'রিয়াযত' বা সাধনার মাধ্যমে, তাসাওউফের তরীকায় এবং আল্লাহর ওলীদের তরীকা অনুসরণের দ্বারা হাসিল করতে পারি। কিন্তু এই বিশেষ-বৈশিষ্ট্যটি অর্থাৎ মু'জিযাকে স্বীকার করা ঈমানের জন্য অপরিহার্য। এ সম্পর্কে ইমাম গায্যালী (রহ.) তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুন্কিযু মিনাদ্-দালাল' এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দার্শনিকদের অভিমত হলো : বি'ছাত বা নবী-রাসূল প্রেরণ খুবই উত্তম কাজ কেননা, এর দ্বারা অনেক উপকার হয়। যেমন-'আক্ল' বা জ্ঞানের শক্তি দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যাপারে বৃদ্ধি পায়, যা জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত; যথা- 'অজুদে বারী তা'আলা' বা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব; আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর কুদরাত সম্পর্কে জ্ঞান-ইত্যাদি। এছাড়া আল্লাহর নবীদের হুকুম বা নির্দেশ থেকে ঐসব ব্যাপারে উপকৃত হওয়া যা জ্ঞানের পরিধির আওতাভুক্ত নয়, যেমন 'কালাম' বা কথা, 'রুইয়াত' বা দর্শন ইত্যাদি, যাতে রাসূলগণের আগমনের পর মানুষের জন্য আর কিছু বলার না থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার 'মুলুকে' বা বাদশাহীতে তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছু করার জন্য যে ভয় সৃষ্টি হয়, নেক-আমলের দ্বারা তা দূরীভূত হয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নেক 'আমল' করে তার জ্ঞান তাকে সঠিক দিক-নির্দেশ করে। নবীগণের কর্ম-কাণ্ড হলো মানুষ ও মানবতাকে রক্ষা করা। কেননা, মানুষেরা পরস্পরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। কাজেই এখন এমন শরীয়তের প্রয়োজন, যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং তার অনুসরণ ও অনুকরণ মানুষের জন্য অবধারিত। আর মানুষের মূল সত্ত্বাকে বিভিন্ন ধরনের ইল্‌ম ও আমল দ্বারা সুসজ্জিত করা প্রয়োজন, যাতে তার মৌলিক গুণ বিকশিত হতে পারে। এ ধরনের লোকদের শিক্ষা হলো-নেক কাজে উৎসাহ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে লোকদের ফিরিয়ে রাখা ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনায় জানা গেল যে, বি'ছাত বা নবী রাসূল প্রেরণ 'ওয়াজীব' বা অপরিহার্য। বস্তুত 'হুস্ন' এর অর্থ যা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। এর সমর্থনে দার্শনিকদের কোন কোন মন্তব্যে দেখা যায় যে, 'বিছাত ওয়াজিব'।

বি'ছাত[৬১] অস্বীকার কারীদের কতিপয় অভিযোগ প্রসঙ্গে

যারা বি'ছাত বা নবী-রাসূল প্রেরণকে অস্বীকার করে, তাদের কতিপয় অভিযোগ হলো :

১. প্রথমতঃ যাকে প্রেরণ করা হয়, সে যেন জানতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে পাঠাচ্ছেন : 'আমি তোমাকে প্রেরণ করছি, কাজেই তুমি আমার পক্ষ থেকে লোকদের কাছে এ বাণী পৌঁছে দাও'। আর প্রেরিত ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের কিছু জানা সম্ভব নয় কেননা, এরূপ 'ইল্‌কা' বা নির্দেশ নিক্ষেপ জিনদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। আর জিন্‌দের অস্তিত্ব সম্পর্কে তোমাদের অভিমতও অভিন্ন।

এ অভিযোগের জবাব হলো : প্রেরণকর্তা এর জন্য দলীল কায়েম করে দেন, যাতে রাসূল জানতে পারেন যে, "আমি তোমাকে রাসূল করে প্রেরণ করেছি", এরূপ বলার মালিক একমাত্র আল্লাহ, জিন্‌ নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এজন্য এমন 'আয়াত' বা নিদর্শনাবলী এবং 'মু'জিযাত' বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন; যাতে সমস্ত মাখ্‌লুক তার মুকাবিলা করতে অপারগ হয়ে পড়ে। আর তা এজন্যে যে, তা তাঁর জন্য 'ইল্‌ম বা জ্ঞানের ফায়দা দেয়, অথবা তাঁর মধ্যে[৬২] অবশ্যই এ জ্ঞান সৃষ্টি করে দেওয়া হয় যে, "আমার প্রেরণকারী এবং নির্দেশ দানকারী হলেন-একমাত্র আল্লাহ"।

২. দ্বিতীয়ত : যে নবীর প্রতি 'ইল্‌কা' বা বাক্য-নিক্ষেপ করে, সে যদি দেহধারী হয়, তবে এ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে যে, 'ইল্‌কার' সময় উপস্থিত সকলে তাকে দেখে ফেলবে', অথচ ব্যাপারটি এ ধরনের নয়, যেমন-তোমাদেরও অভিমত কিন্তু 'ইলকাকারী ব্যক্তি শরীর সম্ভুত না হয়ে যদি রুহ-সম্ভুত হয়, এমতাবস্থায় কথার মাধ্যমে 'ইলকা' বা বাক্য নিক্ষেপ অসম্ভব। কেননা, রুহের প্রতি ওহী নিক্ষেপ, কথা বা বাক্যের মাধ্যমে, অসম্ভব।

বস্তুতঃ প্রথম অংশের জবাব হলো : মালাযামাত অর্থাৎ শরীর সম্ভুত হওয়ার কারণে এরূপ মনে করা যে, উপস্থিত সকলে দেখবে; এ গ্রহণীয় নয়। কেননা, এ দলীল সাপেক্ষে বৈধ যে, আল্লাহ তা'আলা সে সময় উপস্থিত সকলের দেখার শক্তি নাও দিতে পারেন। কারণ, তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর কুদ্‌রত কোন কারণেই অক্ষম নয়।

উল্লেখ্য যে, উপস্থিত ব্যক্তিদের তা দেখার ক্ষমতা না দেওয়া, এটা বাস্তবেও সম্ভব এবং এও আল্লাহর কুদরতের অন্যতম দলীল। যেমন-আমাদের সামনে বড়

---

[৬১] নুবূওত বা পয়গম্বরীর কাল

[৬২] নবী বা রাসূলের মধ্যে।

বড় শহর এবং বড় বড় পাহাড় আছে, কিন্তু আমরা তা সবই দেখতে পাই না। পক্ষান্তরে, ঢোল-তবলা বাজছে; অথচ আমরা তা শুনতে পাইনা, এটা অবাস্তব।

এক্ষণে আমার বক্তব্য হলো : আল্লাহ সুব্হানুহু ওয়া তা'আলা সমধিক অবহিত যে, 'ইল্কা বা নিক্ষেপকারী সত্ত্বা সূক্ষ্ম শরীরের অধিকারী, অর্থাৎ ফিরিশ্তা; এবং এরূপ সত্ত্বাকে দেখা সম্ভব নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় অংশের জবাব হলো : রূহ বা আত্মা হলো একটা লতীফা বা সূক্ষ্ম জিনিস। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই কথা শুনতেন, যা আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর প্রতি ওহী করা হতো। এ আলোচনা আগে করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোন জটিলতা নেই।

৩. তৃতীয়তঃ রিসালাতের প্রত্যয়ন প্রেরিত ব্যক্তির জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, আর সে জ্ঞান হলো : কি তার জন্য জায়েয এবং কি জায়েয নয়। আর এ জ্ঞান কিছু সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব নয়। আর ঐ চিন্তা-ভাবনা যা ঐ জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছায়, তা হাসিলের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়, যেমন-দিন বা বছরের-নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না; বরং তার ব্যক্তিত্ব ও অবস্থার কারণে এতে পার্থক্য হতে পারে। কাজেই দায়িত্ব প্রাপ্ত লোকের জন্য এ হক থাকবে যে, সে দূরদৃষ্টি লাভের জন্য সময় চাইবে। অন্যথায়, সে যদি কোন সময় বলে বসে আমি এসব জানিনা; এমতাবস্থায় তার নবীর দায়িত্ব ক্ষুন্ন হবে এবং ফলে, নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ ধরনের সময় চাওয়ার সুযোগ দেননি, বরং কোন সময় না দিয়েই তাঁকে তা সত্য বলে গ্রহণ করাকে ওয়াজিব করেছেন। এর ফলে, নবীর জন্য "এমন তাক্লীফ বা কষ্ট যা বহনযোগ্য নয়"-অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। কেননা, রিসালাতের সত্যতা আলোচ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে না হলে। তা এমন হবে, যার অস্তিত্ব আদৌ কল্পনা করা যায় না এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে এটা খুবই গর্হিত। আর এ ধরনের কাজ প্রকাশ পাওয়া, মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ হতে খুবই অবাঞ্ছিত।

এ অভিযোগের জবাব হলো : সময় দেওয়া আদৌ জরুরী নয় কেননা, আমি আগেই বর্ণনা করেছি যে, যখন কোন নবী রিসালাতের দাবী করবে এবং সে দাবীর সাথে মু'জিযাও উপস্থিত থাকবে, যা অলৌকিক; তখন তার অনুসরণ করা, কোনরূপ কালক্ষেপন না করেই, ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, মু'জিযা প্রকাশের সাথে সাথেই, নবীর সত্যবাদী হওয়ার বাস্তব জ্ঞান হাসিল হয়ে যায়। অতএব চিন্তা কর, অনুধাবন কর।

চতুর্থত : বি'ছাত বা নবীর প্রেরণ তাকলীফ বা কষ্ট মুক্ত নয়। আর বি'ছাতের ফায়দা এটাই। আর কয়েক কারণে এ কষ্ট বরণ করা সিদ্ধ নয়।

যেমন-১, এ ব্যবস্থা কঠোরতাকে প্রতিষ্ঠা করে; কেননা, বান্দার কাজ আল্লাহর কুদ্‌রতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তোমাদের অভিমত হলো : বান্দার কুদরত বা শক্তি ফলদায়ক নয়; কাজেই অন্যের কাজের জন্য কষ্ট দেওয়া, তা এমন কষ্ট যা বহনযোগ্য নয়, অনুচিত।

এ প্রশ্নের জবাব হলো : বান্দার কুদ্‌রত বা শক্তি যদিও ফলদায়ক নয়, তবুও তার সম্পর্ক হলো কাজের সাথে, যাকে 'কসব' বা উপার্জন বলা হয়। আর এ হিসেবে তাকে কষ্ট দেওয়া জায়েয এবং এজন্যে তা এমন কষ্ট নয়, যা বহনযোগ্য নয়।

২. এ তাক্‌লীফ বা কষ্ট বান্দার ক্ষতি করে। কেননা, এমতাবস্থায় তার উপর কাজের কষ্ট এবং তা পরিত্যাগে 'আযাবের কষ্ট' অবধারিত হয়ে যায়। আর কারো ক্ষতি করা তো মহা অপরাধ এবং আল্লাহ তা'আলা এ থেকে অতি পবিত্র। এর জবাব হলো : তাক্‌লীফ বা কষ্টের মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়ার যে কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত আছে, তা তার ক্ষতির চাইতে বহু গুণ বেশী। যার আলোচনা সামনে আসবে। কাজেই, বহু কল্যাণকে অল্প কষ্টের জন্য পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

৩. এ তাক্‌লীফের মাঝে যে কঠোরতা আছে, হয়তো তা উদ্দেশ্যবিহীন হবে। আর এরূপ হওয়া অবান্তর, নেহায়েত খারাপ। অথবা কোন উদ্দেশ্যের জন্য হবে-যার সম্পর্ক হবে হয়তো আল্লাহর সঙ্গে, অথচ আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য হতে পবিত্র; অথবা তার সম্পর্ক হবে বান্দার সাথে। এ অবস্থায় হয়তো বান্দার ক্ষতি হবে, যা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত নয়, নয়তো বান্দার উপকার হবে। কাজেই, উপকার লাভের জন্য কষ্ট করা এবং তা হাসিল না হওয়ার কারণে আযাব দেওয়া-জ্ঞান বহির্ভূত কাজ। কেননা, এটা ঐরূপ যেন তাকে বলা হয়েছে : তুমি তোমার জন্য উপকার হাসিল কর, অন্যথায় আমি তোমাকে চিরস্থায়ী আযাবে গ্রেফতার করবো।

এর জবাব হলো : জ্ঞান যাকে ভাল বা মন্দ হওয়ার হুকুম দিচ্ছে, এখানকার বক্তব্যটি তার একটি শাখা, অথবা আল্লাহ তা'আলার কাজে উদ্দেশ্য থাকা অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। আমি এ দুটি বক্তব্যকে এখানে বাতিল ঘোষণা করছি। বরং তাক্‌লীফ্ বা কষ্ট এমন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যা বান্দার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল হাসিলের জন্য যে সব কষ্টদায়ক কাজ সম্পন্ন করতে হয় তার লাভ, ক্ষতির চাইতে বহুগুণে অধিক। বাকী থাকলো বান্দার শাস্তির ব্যাপারটি। কিন্তু এ শাস্তি এ কারণে নয় যে, সে কোন উপকার হাসিল করেনি-তাই; বরং তার শাস্তির কারণ হবে সে তার মনিব বা সর্দারের হুকুম মান্য করেনি-সেজন্য। কারণ, এখানে মনিবকে ঘৃণা করা হয়েছে।

আমি বলতে চাই-এবং আল্লাহু সুব্হানুহু ওয়া তা'আলা অধিক জ্ঞানী-যে, অভিযোগকারী এরূপ বলতে পারতো যে, আল্লাহ সুব্হানুহু ওয়া তা'আলা কেন তাকে তাক্লীফ দেবেন, এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে, বান্দা তার পায়রবী করবে না? আর না তিনি তার দ্বারা কোন ফায়দা হাসিল করবেন?

কাজেই, এর দ্বারা তার তো কেবল ক্ষতিই করা হবে এবং এ কাজটি খুবই মন্দ।

এর জবাব এভাবে দেওয়া যেতে পারে : তাক্লীফ যদিও তার ক্ষতি করে তবুও বড় কল্যাণ লাভের জন্য, কম ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া জ্ঞানের দিক দিয়েও উচিত। কাজেই, এ মন্দ নয় যেমন আগে আলোচিত হয়েছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে : কাফিরদের তাক্লীফ দেওয়ার মধ্যেও ফায়দা বা উপকার আছে। এ হলো সওয়াবের বিপরীত, সওয়াব নয়। কেননা, যিনি তাক্লীফ দেন, তার অনুসরণের কারণে সওয়াবের ফায়দা হাসিল করা হয়; সেটা তাক্লীফের ফায়দা নয়। ব্যাপারটি এ উদাহরণের সাহায্যে বুঝা সহজ হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিল, অথচ সে জানে যে, সে ব্যক্তি তার দাওয়াত আদৌ কবুল করবে না, কিন্তু তবুও সে তাকে দাওয়াত দেওয়ার সময় বিভিন্ন কায়দায় ভদ্র ও মার্জিতভাবে দাওয়াত দিল। যদি দাওয়াতকারী, দাওয়াতের সময় এরূপ ভদ্র ও মার্জিতভাবে দাওয়াত না দিত, তবে সে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতো।

বি'ছাত এবং শরীয়তের হিক্মাত

এখানে ঐ কথাগুলো আলোচনা উত্তম এবং উপকারী হবে, যা "হুকামায়ে ইসলাম" বা ইসলামের বিজ্ঞ-আলিমগণ বলেছেন যে, "তাক্লীফে হাসান" বা উত্তম-কষ্ট। এর ব্যাখ্যা হলো : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এরূপে পয়দা করেছেন যে, সে তার দৈনন্দিন জীবন যাপনে স্থির নয়; কেননা, তার জন্য প্রয়োজন হয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, এছাড়া অন্যান্য উপকরণও, যেমন হস্তশিল্প, কারুশিল্প ইত্যাদি। কিন্তু এ কাজে একজন কারিগর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং একটি জামা'আত বা গোষ্ঠীর সম্মিলিত সাধনা ও প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে তা বাস্তবায়িত হয়। আর তা এভাবে যে, প্রত্যেক সাথী অন্যের প্রয়োজনে পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। যেমন, একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য কাপড় সেলাই করে, আবার অপর ব্যক্তি তার জন্য সূঁচ তৈরী করে দেয়। সমস্ত কাজ-কর্ম এর উপর 'কিয়াস' বা ধারণা করা যেতে পারে। কাজেই জানা গেল যে, মানুষের জীবনে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই

তৈরী হয়ে থাকে। সেজন্য বলা হয় : মানুষ সামাজিক জীব। কেননা, পারস্পরিক সম্মিলিত জীবন যাপনই তাদের উন্নতির একমাত্র কারণ। আর এই সম্মিলিত জীবন ব্যবস্থা তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন সে সমাজে 'আদল ও ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠিত থাকে। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি সেটাই পেতে আগ্রহী হয় যার সে মুখাপেক্ষী; আর সে তার প্রতি ক্ষুদ্ধ ও রাগান্বিত হয়, যাতে তার ক্ষতি ও লোক্‌শান হয়। আর এ কারণেই একজন অপরজনের জুলুমের শিকারে পরিণত হয়, যখন সে অন্যের হকের তোয়াক্কা করেনা; ফলে, সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত জীবন ব্যবস্থা পদ্ধতিতে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত কাজ কারবার ও লেনদেনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন খুব বেশী, যে জন্য আইন-কানুন তৈরীর গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই নিয়ম-কানুন, শরীয়তের হুকুম-আহকাম বা বিধি-বিধান। কাজেই, শরীয়তের বিধি-বিধান প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাখ্যা-দাতার প্রয়োজন। আর এ ধরনের লোকেরা, যারা শরীয়তের ব্যাখ্যা প্রদান করে, তারা যদি পরস্পর কলহে লিপ্ত হয় তবে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায়, শরীয়তের পূর্ণ পায়রবীকারী ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অন্যদের উচিত তার ইত্তেবা' বা অনুসরণ করা। আর এ ধরনের ব্যক্তিত্বের চেনার মাধ্যম হলো-তারা আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত বিধি-বিধানের পূর্ণ অনুসারী হবে; আর এটিই মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে, অধিকাংশ সাধারণ লোক শরীয়তের হুকুম আহকামকে তখন ঘৃণা বা অবজ্ঞার চোখে দেখে, যখন তার মধ্যে দুনিয়ার আপাতঃ মধুর জিনিসের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায়, সে গোনাহে লিপ্ত হয় এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের বিপরীতে কাজ করতে সাহসী হয়। বস্তুত, যখন ফরমারবরদার বান্দাদের জন্য ছওয়াব হবে এবং নাফরমানদের জন্য শাস্তি হবে, তখন আশা এবং ভয় তাকে শরীয়তের বিধান মানতে এবং গোনাহের কাজ পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করবে এবং শরীয়তের এ ব্যবস্থা, সে ব্যক্তির জীবন পদ্ধতিতে, বিরাট প্রভাব ফেলবে। এর ফলশ্রুতিতে তার জন্য শরীয়তের বিধান দাতা এবং বিনিময় দানকারী তথা আল্লাহর মা'রিফাত বা পরিচয় লাভ করা একান্ত জরুরী। এ কারণে শরীয়তের বিধানদাতা এবং কর্মের প্রতিফল দানকারী তথা আল্লাহ তা'আলার জন্য উল্লেখিত 'ইবাদত' ফরয করা হয়েছে এবং বার বার সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে তা মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমতাবস্থায় উচিত হলো-শরীয়তের বিধি-বিধান প্রচারকারী, মানুষকে এমন 'খালেক' বা স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দেবে, যাকে সে স্রষ্টার তরফ থেকে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং সে সত্যবাদীও। সে প্রেরিত ব্যক্তি তাদেরকে

খোশ-খবর দেবে এবং ভীতি প্রদর্শন করবে, আখিরাতের ছওয়াব ও আযাবের কথা বলবে এবং ‘ইবাদাতের সাথে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য দাওয়াত দেবে, যাতে স্রষ্টার স্মরণ বা জিক্‌র আন্তরিকতার সাথে করতে পারে। আর সেই ‘সুন্নাত’ বা তরীকার দিকে দাওয়াত দেবে, যা লোকদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন হয়। যার ফলশ্রুতিতে মানব সমাজে ‘আদ্‌ল ও ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই সুন্নাতের প্রয়োগ তিন ধরনের কাজে উপকারী হয়। যথা :

১ ‘খাহেশাতে-নাফ্‌সানী’ বা প্রবৃত্তির আসক্তি থেকে মানুষ ‘রিয়াযত বা সাধনার দ্বারা মুক্ত হতে পারে। কেননা, প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি কখনো আল্লাহর রহমত বা অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হয় না।

২. এমন পবিত্র ও সমুন্নত ব্যাপার সম্পর্কে সব সময় চিন্তা-ভাবনা করা, যা জড়-জীবন তথা দুনিয়ার আবিলতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত এবং তা মানুষকে মহান-সত্ত্বা আল্লাহর নিকটে পৌঁছতে সাহায্য করে; এবং

৩. শরীয়তের বিধানদাতা-তথা আল্লাহর ভয় করা এবং নেক্‌কারদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা এবং বদ্‌কারদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির কথা স্মরণ হওয়া, যা দুনিয়াতে ‘আদ্‌ল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক হয় এবং আখিরাতে পুরস্কার বা তিরস্কার পাওয়াকে অবশ্যম্ভাবী করে। এসব হলো ‘হুকামায়ে ইসলাম’ বা ইসলামের প্রখ্যাত জ্ঞানী-গুণীদের বক্তব্য।

এর পাশাপাশি মু’তাযিলাদের বক্তব্য হলো : ‘আক্‌ল বা জ্ঞানের দিক দিয়ে ‘তাক্‌লীফ’ বা কষ্ট ওয়াজিব। কেননা, তা মানুষকে অশ্লীল, অপকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে। বস্তুত, মানুষ স্বভাবগতভাবে আরামদায়ক ও উপাদেয় বস্তুকে পছন্দ করে। তাই, যখন সে জানতে পারবে যে, এসব হারাম, তখন সে তা থেকে বিরত থাকবে। আর অশ্লীল, অপকর্ম ও পাপাচার থেকে দূরে থাকা একান্ত জরুরী।

চতুর্থ কারণ হলো :[৬৩] তাক্‌লীফ বা কষ্ট হয়তো কর্মের অস্তিত্বের সাথে হবে, তা অবশ্যম্ভাবী হওয়া এবং তা বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য নির্ধারণ করাতে কোন ‘ফায়দা’ বা উপকার নেই; কেননা, সে সময় তা নিষ্পন্ন হওয়া বেহুদা ও ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর এ অবস্থা তখনও হবে, যখন ‘তাকলীফ’ বা কষ্ট কর্মের পরে হবে; কেননা এ হবে কিছু লাভের পর তাক্‌লীফ, অথবা তাক্‌লীফ হবে কর্মের অস্তিত্বের সঙ্গে। আর এ ধরনের তাকলীফ এমন পর্যায়ের যা বহনযোগ্য নয়। কেননা, কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগে তা সংঘটিত হয়েছে, এরূপ ধারণা অবাস্তব। বস্তুত, কোন কিছুর অস্তিত্ব, তার অনস্তিত্বের মাঝে হয় না।

---

[৬৩] যে কারণে কাউকে শাস্তি বা কষ্ট দেওয়া যাবে না

এর জবাব হলো : আমাদের মতে, 'কুদ্‌রত' বা শক্তি-সামর্থ কর্মের সাথী, আর এর তাক্‌লীফ' এ পর্যায়ে অসম্ভব নয়। আর এটা তো সে সময় হয়, যদি কর্ম তা সম্পন্ন হওয়ার আগে হাসিল হয়, যাতে সে নিমগ্ন থাকে। আর এটা ঐরূপ ব্যাপার নয়, বরং তা নিষ্পন্ন হওয়ার পর হাসিল হয়। এতদ্ব্যতীত, আমরা এরূপও বলতে চাই যে, 'তাক্‌লীফ' হলো নতুন কিছু সম্পন্ন হওয়ার মত; তাই হয়তো তা তার অস্তিত্বের সময় হবে, অথবা তা তার অনস্তিত্বের সময় সম্পন্ন হবে। এমতাবস্থায়, দুটো বিপরীতধর্মী জিনিসের একত্রিত হওয়া বুঝা যায়, যা অবাস্তব। আর নতুন কিছু সম্পন্ন হওয়া, ঐ ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই, এ ব্যাপারে তোমাদের যে জবাব হবে, তাক্‌লীফের ব্যাপারে আমার জবাবও সেরূপ।

মু'তাযিলারা এ অভিযোগের উত্তর এভাবে দিয়েছে যে, কর্ম নিষ্পন্ন হওয়ার আগে 'তাক্‌লীফ' হওয়া, এ ধরনের 'তাক্‌লীফ' এমন পর্যায়ের নয়, যা বহন করা যায় না।

কেননা, বর্তমান অবস্থার 'তাকলীফ', অন্য অবস্থায়ও আপতিত হতে পারে; ব্যাপারটি এমন নয় যে, তা এখনই আপতিত হবে। কেননা, এমন হলে দুটি বিপরীতধর্মী জিনিসের সম্মিলন হওয়া, অর্থাৎ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব একত্রিত হওয়া, অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে; যা আদৌ সম্ভব নয়। যেমন, কাফিরকে বর্তমানে সেজন্য 'তাক্‌লীফ; দেওয়া হলো যে, সে দ্বিতীয় অবস্থায় যখন ঈমান আনলো। আর এটা প্রণিধানযোগ্য কেননা, সে যদি দ্বিতীয় অবস্থায় কুফ্‌রীর মধ্যে থাকে, তখন তার মধ্যে ঈমান আনার 'কুদরত' বা শক্তিই থাকবে না। আর যদি সে ঈমান নিয়ে আসে, তবে সে আর শাস্তিযোগ্য থাকবে না। কেননা, নির্দিষ্ট কিছু লাভের পর তার জন্য শাস্তি হওয়া অসম্ভব।

এর জবাব এভাবেও দেওয়া যেতে পারে, 'তাক্‌লীফ' বা কষ্ট তার সাথেই সম্পৃক্ত, যা সামর্থের মধ্যে থাকে। আর এ কারণেই তা অবশ্যম্ভাবী হয় যে, যার জন্য তাকে 'তাকলীফ' দেওয়া হলো, তা সম্পন্ন হওয়ার সময় সে সমর্থ থাকবে। এখন অবশিষ্ট থাকলো 'কুদ্‌রাত' ও 'তাক্‌লীফের একত্রিত হওয়া এবং এখানে তা হয়নি। এতদ্ব্যতীত, নির্দিষ্ট কিছু লাভের পর তার জন্য শাস্তি দেওয়া তখন উচিত নয়, যখন দ্বিতীয় কিছু করার পর তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং ঐ কাজের জন্য নয়, যেমন আলোচিত হয়েছে।

এখন যদি তুমি এরূপ প্রশ্ন কর যে, কুফ্‌রীতে লিপ্ত থাকার কারণে, অন্য অবস্থায় তার ঈমান আনার সামর্থের কোন অন্তরায় হয় না; কেননা, কুফরীতে থাকাবস্থায় ঈমান তার খেয়াল অনুযায়ী সামর্থে থাকে। বস্তুত, কুদ্‌রাত বা সামর্থ

কর্মের আগে থাকে, যাতে কাফিরকে ঈমানের পূর্বে 'তাকলীফ' দেওয়া যেতে পারে। আর এটা এ কায়দায় যে, যে কাজ সামর্থের আওতায় নয়, তার জন্য 'তাক্‌লীফ' দেওয়া হয় না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সামর্থের বাইরে তাক্‌লীফ দেন না"।[৬৪] এমতাবস্থায়, প্রথম অংশের অনুকরণে উত্তর সঠিক হতে পারে, যেমন তুমি দেখতে পাবে।

কাজেই, আমার অভিমত হলো : (আর আল্লাহু সুব্‌হানুহু তা'আলা এ ব্যাপারে সমধিক অবহিত যে), প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য হয়তো এরূপ যে, দ্বিতীয় অবস্থাতেও কুফ্‌রীতে লিপ্ত থাকা কালীন সময়ে তার ঈমান আনার সামর্থ থাকবে না। কেননা, এরূপ অবস্থায় 'অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের' সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়, যা অসম্ভব।

সুতরাং তার এই ওযর বা আপত্তি যে, 'বর্তমান অবস্থার শাস্তি, তাকে দ্বিতীয় অবস্থায় দেওয়া যাবে,' এতে কোন 'ফায়দা' বা উপকার নেই। কাজেই, এর উপর ভিত্তি করে জবাব দেওয়া সঠিক হবে না। ব্যাপারটি স্পষ্ট, তুমি-ই চিন্তা করে দেখ।

পঞ্চমতঃ যে কারণে তাক্‌লীফ দেওয়া যাবে না, তাহলো : কিছু কিছু 'মুলহেদ' বা নাস্তিকের খেয়াল হলো শরীরের জন্য যে কাজগুলো কষ্টকর, যেমন- গোপনে আল্লাহ তা'আলার মা'রিফাত বা পরিচয় লাভের জন্য চেষ্টা করা, বা তাঁর সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করা, বা ঐ সমস্ত কাজ-কর্ম-যা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে সে ব্যাপারে চিন্তা করা যায় না, ফলে, তার মধ্যে যে কল্যাণকর দিক প্রচ্ছন্ন থাকে, তা বাদ পড়ে যায়; অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার তাক্‌লীফ। পরন্ত, ঐসব কাজ-কর্ম, যার মধ্যে তাক্‌লীফ বা কষ্ট নিহিত আছে-তা সবই জ্ঞানের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

এ বক্তব্যের জবাব হলো : আল্লাহ সুব্‌হানুহু তা'আলার মা'রিফাতের ব্যাপারে 'ফিক্‌র' বা চিন্তা করাই হলো-সর্বোত্তম চিন্তা, আর এটাই 'তাক্‌লীফ' বা কষ্টের আসল উদ্দেশ্য। অন্যান্য 'তাক্‌লীফ' এর পরিপূরক বা সাহায্যকারী। আর চেষ্টা বা পরিশ্রমকারীর জন্য সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য এ হলো উৎকৃষ্ট পন্থা। কারণ, আল্লাহ তা'আলার মারিফাত লাভের প্রচেষ্টায় যে সময়টি অতিবাহিত হয়, তা অত্যন্ত মূল্যবান এবং তা দুনিয়াবী পেরেশানী থেকে মানুষকে হিফাজাত

---

[৬৪] আল্-কোরআন; ২ : ২৮৬ আয়াত দ্রষ্টব্য।

করে। কাজেই, এ ধরনের 'তাকলীফ' দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য খুবই প্রয়োজন।

পঞ্চম কারণের উপর আরো প্রশ্ন হলো : বি'ছাতের পক্ষ হতে 'আক্ল' বা জ্ঞানের সিদ্ধান্তই যথেষ্ট, তাই এতে কোন 'ফায়দা' বা উপকার নেই। তারা দলীল স্বরূপ বলে যে, 'আক্ল' যে জিনিসকে উত্তম বলে তা করতে হবে এবং যাকে খারাপ বলে, তা পরিত্যাগ করতে হবে। আর 'আক্ল' বা জ্ঞান যে জিনিসের ভাল-মন্দ হওয়ার ব্যাপারে কিছুই বলেনা, প্রয়োজনের সময় তা করা যেতে পারে। কাজেই, প্রয়োজনের সীমা নির্ধারণ করা জরুরী, যাতে কাজটি বাদ পড়লে বা পরিত্যাগ করলে, তাতে যেন কিছু না যায় আসে, অর্থাৎ কোন ক্ষতি না হয়।

এ বক্তব্যের জবাব হলো : শরীয়তের বিধি-বিধান যা বি'ছাতের দ্বারা উপকার প্রাপ্ত, এ ফায়দা হাসিল হয় তার বিস্তৃত বর্ণনার দ্বারা, যাকে জ্ঞান সংক্ষেপে ভাল-মন্দ, উপকারী-অপকারী হিসেবে চিহ্নিত করে; এবং বি'ছাতের দ্বারা ঐ বিষয়-বস্তু বর্ণনা করা হয়, যা বর্ণনা করতে 'আক্ল বা জ্ঞান অপারগ। কেননা, যারা 'আক্লের নির্দেশে পরিচালিত হয়, তারা তা অস্বীকার করতে পারে না। আর এমন কিছু বিষয় বা ব্যাপার আছে, যেখানে 'আক্ল বা জ্ঞান কিছুই বলতে সক্ষম হয় না। যেমন :-অযীফাসমূহ যা 'ইবাদত হিসেবে করা হয়, শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্কামের সীমা নির্ধারণ, উপকারী ও অপকারী বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদান। বস্তুত শরীয়তের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠাকারী নবী হলেন ঐ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায়, যিনি ঔষধ এবং তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফ্হাল। এটা এমন এক ব্যাপার, যদি সাধারণ লোকের অর্জিত অভিজ্ঞতার দ্বারা এটা হাসিল করা সম্ভব হতো, তবে তার জন্য প্রয়োজন হতো দীর্ঘদিনের। যার ফলে, তারা তার উপকার থেকে মাহরুম বা বঞ্চিত হতো, আর সে জ্ঞানের পূর্ণতার স্তরে পৌঁছাবার আগেই তারা হালাক বা ধ্বংস হয়ে যেতো। কেননা, এ সময়ে তারা এমন ঔষধ ব্যবহার করতো, যা তাদের জন্য হতো ক্ষতিকর, যার ফলশ্রুতিতে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। উপরন্তু, এ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হতো এবং প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করার কারণে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অনেক অন্তরায় সৃষ্টি হতো।

কাজেই, যখন তারা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে সুপরামর্শ গ্রহণ করে ঔষধ প্রয়োগ করবে, তখন তাদের কষ্ট লাঘব হবে। ফলে, তার দ্বারা তারা উপকৃত হবে এবং অপকার থেকে নিস্তার পাবে। সুতরাং, যেরূপে উপরোক্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভের সম্ভাবনায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সুপরামর্শকে উপেক্ষা

করা ঠিক হবে না, সেরূপে কষ্ট ও কর্ম বিষয়ক জ্ঞান লাভের সম্ভাবনার ব্যাপারে এরূপ বলা যাবে না যে, এখানে 'আক্‌ল বা জ্ঞানের পার্থক্য হওয়ার কারণে, মাব্‌'উছ বা প্রেরিত বিষয়কে উপেক্ষা করতে হবে। এটা কিরূপে বলা যেতে পারে? কেননা, নবী তো সে বিষয়-ই জানেন, যা আল্লাহ সুব্‌হানুহু ওয়া তা'আলা তাঁকে অবহিত করেন। আর এটা কেবল ঐ চিকিৎসকের খেলাফ, যে কেবল তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা এ সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছে, যা সে জানে। কাজেই, এরূপ চিকিৎসক যখন তার জ্ঞানের অমুখাপেক্ষী নয়; তখন নবী তো আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত জ্ঞানের অমুখাপেক্ষী আদৌ হতে পারেন না। এতক্ষণ যে বিষয়ের অবতারণা করা হলো, তাতে 'ইছবাতুন নুবূওত'[৬৫] 'হুস্‌নে তাক্‌লীফ'[৬৬]এর ব্যাপারে 'হুকামা' বা জ্ঞানীদের অভিমত বর্ণনা করা হলো। এ প্রসংগের আলোচনা এখানেই শেষ করা হচ্ছে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন বা অভিযোগ হলো : মু'জিযা নিষিদ্ধ; কেননা এ স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপার। একে বৈধ বলা নির্বুদ্ধিতা বই কিছুই নয়। সুতরাং মু'জিযার দ্বারা নুবূওত ছাবিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এর জবাব হলো : আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার প্রথম সৃষ্টির চাইতে, মু'জিযা অধিক তাজ্জবের ব্যাপার নয়। আর এমন অনেক জিনিস আছে, যার মধ্যে অলৌকিকত্ব থাকা বা না থাকার কারণে, তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। এতদসত্ত্বেও, বাস্তব ব্যাপার এই যে, অলৌকিক ব্যাপার আম্বিয়া ও আউলিয়াদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি প্রচলিত রীতি, যা সর্বকালে এবং সর্বযুগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই জ্ঞানী প্রশ্নকারীর উচিত হবে না তা প্রত্যাখ্যান করা। বরং আমাদের কথা হলো : আমাদের কাছে মু'জিযা ঐ জিনিস, যদ্দারা রিসালাতের সত্যতা প্রতিপাদন করা হয়; যদিও তা স্বভাব বিরুদ্ধ হয়। আমি বলবো, এখানে প্রশ্ন এ কারণে উত্থাপিত হয়েছে যে, এটা তার বিপরীত, যা মু'জিযার-শর্ত হিসেবে আগে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বভাব বিরুদ্ধ হওয়া মু'জিযার জন্য অন্যতম শর্ত। আর এ কারণেও যে, যদি এরূপ না হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ের মত মু'জিযাও সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে না। কাজেই, এখন তুমি হৃদয়ঙ্গম কর।

সপ্তম প্রশ্ন বা অভিযোগ হলো : মু'জিযা প্রকাশ পাওয়াতে নবীর সত্যবাদীতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেননা, হতে পারে হয়তো সে যাদুকর, অথবা তার নিজের

---

[৬৫] নুবূওতের প্রমাণ।

[৬৬] উত্তম-কষ্ট।

তেলেসমাতী কাজ, যার সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন সম্পর্ক নেই। আর তোমরা এ ব্যাপারে একমত যে, এটি সত্য এবং অলৌকিক প্রভাবও যা কোন তেলেসমাতীর কারণে সংঘটিত হয়, আর যার জ্ঞান তার আছে।

এর জবাব হলো : জ্ঞানতঃ যা ধারণা করা হয়, তা আসল জ্ঞানের পরিপন্থি নয়। যেমন-অনুভূতির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেননা, আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, শরীরের বিশেষ অংগ-প্রত্যংগ দিয়ে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তা অন্য অংগ-প্রত্যংগ দিয়ে হাসিল হয় না; বরং যখন তা হাসিল হয়, তা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে হয় এবং বাস্তবতার অনুরূপ হয়। আর এভাবে এ-ও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ঐ অনুভূতির সন্দেহ তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না, যখন তা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রদান করে। আর অভ্যাস-অনুভূতির ন্যায় এও জ্ঞান হাসিলের একটি মাধ্যম। সুতরাং এটাও বৈধ যে, অনুভূতি যখন কোন জিনিসকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে সাহায্য করে, তখন অভ্যাসের দ্বারাও কোন কিছুতে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করা যেতে পারে; যদিও তাতে অপূর্ণতার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।

বস্তুত আগে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে কোন কিছুতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী হলেন-একমাত্র আল্লাহ। কাজেই' মু'জিযা হলো আল্লাহর-ই কাজ, এটা নবীর কাজ নয়। পক্ষান্তরে, যাদু, তেলেসমাতী-ঐ স্তরের কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়, যা মু'জিযার মধ্যে আছে। যেমন : সমুদ্রকে দ্বিধা-বিভক্ত করা, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, জন্মান্ধ ব্যক্তিকে চক্ষুস্মান করা এবং কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করা-এটা যাদুর দ্বারা সম্ভব নয়। কাজেই, প্রমাণিত হলো যে, যাদুর সাথে মু'জিযার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই; তাই বলা যেতে পারে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা ও সন্দেহের অবকাশ নেই।

অপরপক্ষে, কোন যাদুকরের যাদু যদি অলৌকিকত্বের স্তরে পৌঁছে, তবে হয়তো সেখানে নুবূওতের দাবী থাকবে না; এমতাবস্থায় স্পষ্ট যে, তা নবীর মু'জিযার সাথে সংমিশ্রিত হবে না; অথবা সেখানে নুবূওতের দাবী থাকবে; এমতাবস্থায়, দুটি অবস্থার একটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যথা :-১. হয়তো আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হস্তে তা সম্পন্ন বা সৃষ্টি করবেন না; অথবা, ২. তিনি ছাড়া তার মুকাবিলা বা প্রতিহত করতে আর কেউ সক্ষম হবে না; অন্যথায় মিথ্যাবাদীর প্রত্যায়ন করা হবে। আর যাদু মিথ্যা হওয়ার কারণ তা সত্যে পরিণত করা বা বাস্তবায়িত করা-আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কখন-ই সম্ভব নয়।

অষ্টম প্রশ্ন বা অভিযোগ হলো : মু'জিযা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ঐ ব্যক্তির পক্ষে, যে তা নিজে অবলোকন করেনি, 'তাওয়াতুর' বা বর্ণনা পরম্পরার দ্বারাই

সম্ভব, আর তা জ্ঞানের ফায়দা দেয় না। সুতরাং কোন ব্যক্তির নুবূওতের জ্ঞান, ঐ ব্যক্তি হাসিল করতে পারে না, যে তাঁর মু'জিযা অবলোকন করেনি। আর আগেই বলা হয়েছে যে, 'তাওয়াতুর' বা বর্ণনা পরস্পরা-লব্ধ কোন কিছু জ্ঞানের ফায়দা দেয় না। কেননা, যারা বর্ণনাকারী তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে; আর এভাবে সকল বর্ণনাকারীর মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায়না। কেননা, সকলের মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রতীয়মান হওয়া তাদের প্রত্যেকের মিথ্যাবাদী হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

এর জবাব হলো : সকলকে এ দৃষ্টিতে সমষ্টিগত মনে করা-গ্রহণযোগ্য ব্যাপার নয়, যাতে সকলের উপর একই হুকুম লাগানো যেতে পারে। কেননা, বাস্তবে দেখা যায় যে, দশ ব্যক্তির সম্মিলিত শক্তি কোন ভারি জিনিসকে স্থানচ্যুত করতে সক্ষম হয়, যেখানে তারা আলাদা আলাদাভাবে চেষ্টা করলে এবং শক্তি প্রয়োগ করলে তা সামান্য হেলাতেও সক্ষম হয় না। অতএব, সম্মিলিত বর্ণনা পরস্পরার মাধ্যমটিও ঐরূপ শক্তিশালী। কাজেই, এখানে খামাখা সন্দেহ সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই।

নবম প্রশ্ন বা অভিযোগ হলো : আমরা শরীয়তের বিধি-বিধান নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করেছি, কিন্তু আমরা যা পেয়েছি তাহলো : এটা 'আক্ল ও হিক্মতের' বা জ্ঞান-বুদ্ধির অনুরূপ নয়। কাজেই, আমরা ধরে নিয়েছি যে, শরীয়তের হুকুম-আহকাম আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আসেনি। যেমন এ কাজগুলি : পশু কুরবানী করাকে 'মুবাহ নির্ধারণ করা এবং তাদের ভক্ষণ করা বা তাদের দ্বারা অন্য উপকার নেওয়ার জন্য তাদেরকে 'তাক্লীফ' বা কষ্ট দেওয়া; নির্দিষ্ট কিছু দিনে[৬৭] (মাহে রমযানে) ক্ষুধা-তৃষ্ণা বরদাশ্ত করাকে ওয়াজিব বা অপরিহার্য মনে করা এবং আনন্দদায়ক কাজ-কর্ম (স্ত্রী সহবাস) থেকে বিরত থাকা, যাতে শরীর ফুর্তি অনুভব করে, তাছাড়া শরীরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ময়দান অতিক্রম করা[৬৮] (অর্থাৎ হজ্জে গমন করা), এবং বিশেষ বিশেষ স্থান যিয়ারত বা তওয়াফ করা[৬৯] ও কোন কোন স্থানে অবস্থান করা[৭০] (ওকুফে আরফা), কোন স্থানে সা'য়ী করা বা দৌড়ান,[৭১] যদিও ঐ স্থানসমূহ অন্যান্য স্থানের ন্যায়-এতে লাভ কি? তাছাড়া বাচ্চাদের ন্যায় মাথা খোলা রাখা এবং

---

[৬৭] মাহে রমযানে রোযা রাখাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

[৬৮] হজ্জে গমন করাকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

[৬৯] আল্লাহর ঘর তওয়াফ করা অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে।

[৭০] আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

[৭১] সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানোকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

খালি পায়ে থাকাতে উপকার কি?[৭২] তাছাড়া প্রস্তর নিক্ষেপ করা, যেখানে কেউ নেই এর ফায়দা কি? এতদ্‌ভিন্ন এমন এক পাথরকে চুম্বন করা (হাজ্‌রে আসওয়াদকে), যার অন্য পাথরের উপর কোন ফযীলত নেই-এতে লাভ কি? তাছাড়া, স্বাধীন সুন্দরী, সুশ্রী যুবতীদের দিকে তাকানোকে হারাম নির্ধারন করা এবং সুন্দরী দাসীদের দিকে দৃষ্টিপাত করাকে বৈধ মনে করা-এসব পাগলের প্রলাপ উক্তি নয় কি?

ভাল ও মন্দের ব্যাপারে আক্‌লের বিধান সমর্থন করে এবং এসব কাজের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যকে জরুরী হিসেবে মেনে নিয়ে-জবাব হলো : যারা এর সমালোচনা করেছেন, তারা এর আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। আর এ কারণেই এটা বলা যাবে না যে, এসব কাজের মধ্যে বাস্তবে কোন ফায়দা বা উপকার নেই। বস্তুত এটাও সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা ঐসব কাজের মধ্যে বান্দাদের জন্য কল্যাণের ফয়সালা করেছেন। এ সম্পর্কে আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, জ্ঞানের উর্দ্ধে এমন একটা স্তর আছে, যেখানে এমন একটি চোখ উন্মোচিত হয়, যদ্বারা অদৃশ্যের এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারগুলি, যা পরে অনুষ্ঠিত হবে, তা স্পষ্ট দেখা যায়। আর এ ব্যাপারে জ্ঞানের কোন অধিকার নেই। যেমন-অনুভূতি শক্তি দিয়ে-কোন্‌টি ভাল, আর কোন্‌টি মন্দ তা নির্ধারণ করা যায় না। এ ব্যাপারে আরো অধিক, বিস্তারিত আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হবে ইনশা-আল্লাহ।

[৭২] ইহ্‌রাম অবস্থায় যেভাবে বস্ত্র পরিধান করতে হয়, তাকে বিদ্রুপ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

খাতিমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবূওতের প্রমাণ

তুমি জেনে রাখ যে, এমন কিছু বিশেষ ব্যাপার আছে, যেখানে 'আক্ল বা জ্ঞানের দৃষ্টি আদৌ পৌঁছাতে সক্ষম নয়। বরং এরই সম্ভাবনা অধিক যে, হয়তো জ্ঞান তা অস্বীকার করবে এবং তা অসম্ভব বলে ফায়সালা দেবে। কাজেই আমাদের উচিত হবে তার সম্ভাবনা বরং তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য দলীল পেশ করা। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি এভাবে পরিষ্কার করা যেতে পারে যে, এক তোলা আফিম কোন মানুষের জীবননাশের জন্য যথেষ্ট। কারণ, আফিম খুবই শীতল। তাই, এর সেবনে শরীরে রক্ত জমে গিয়ে-তা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, লোকটি মারা যায়। পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই জানে যে, মাটি ও পানি, এ দু'টি পদার্থই শীতলতা সৃষ্টিকারী। এও সর্বজনবিদিত যে, কয়েক সের পানি ও মাটি একত্রিত করলেও তা দিয়ে এক তোলা আফিমের সমান শীতলতা সৃষ্টি হবে না। এখন ধরুন, কোন পদার্থ বিজ্ঞানী যিনি আফিমের উক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন, তাকে যদি আফিমের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়, তখন তিনি অবশ্যই বলবেন-এটা সত্য কথা নয়। কারণ, এতে অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় গরম পদার্থও রয়েছে। সুতরাং এ এত শীতল নয়।

উক্ত উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করুন, দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের যুক্তি-প্রমাণ অনুরূপ নয় কি? যে কোন বস্তু বা বিষয়কে তারা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ অনুভূতি দিয়ে বিচার করতে চায় এবং যা কিছু এর আওতায় আসে না, তা তারা অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করে।

স্বপ্ন সম্পর্কেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। সত্য বা খাঁটি স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা যদি মানুষের না থাকতো, এমতাবস্থায় কেউ যদি দাবী করতো যে, কোন বিশেষ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলো যখন নিষ্ক্রিয় থাকে এবং চিন্তা ও উপলব্ধি বাহ্যতঃ অকেজো হয়ে পড়ে; তখন তার অন্তর্দৃষ্টিতে ভবিষ্যত উদ্ভাসিত হয় এবং সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এতদশ্রবণে উক্ত অপক্কজ্ঞান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকরা অবশ্যই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে। কারণ, ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন জ্ঞানের উৎস আছে বলে তারা স্বীকার করে না। অনুরূপভাবে, অগ্নিক্রিয়ার সাথে যদি মানুষের পূর্ব পরিচয় না থাকতো এবং কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি তাদের বলতো যে, পৃথিবীতে এমন একটি অদ্ভুত পদার্থ আছে, যার বিন্দুমাত্র কণা বা স্ফুলিঙ্গ একটি গোটা শহর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট; তাহলে লোকে তাকে বিশ্বাস করতো না।

এখানে অপর পক্ষের পণ্ডিতদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা হলো : বিশ্লেষণযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও তোমরা আফিমের অসাধারণ শীতলতার কথা স্বীকার করেছো; তাহলে শরীয়ত ও ধর্মীয় বিষয়াদির তাৎপর্য ও গুরুত্ব অস্বীকার করার যুক্তি কি? অথচ এগুলোর বিশেষ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, মানসিক প্রতিকার ও আত্মিক সংস্কারের সাথে এগুলোর সম্পর্ক এবং নুবূওতের

د	ط	ب
ج	ه	ز
ح	ا	و

ح	ج	د
ا	ه	ط
و	ز	ب

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

٢	٧	٦
٩	٥	١
٤	٢	٨

দৃষ্টি ছাড়া এগুলো অবলোকন করা যায় না।

আরো মজার ব্যাপার এই যে, তাদেরই জনৈক পণ্ডিতের রচনা "আজায়েবুল খাওয়াস" গ্রন্থে কতিপয় নক্‌শা[৭৩] অংকিত আছে। সেখানে লেখা আছে যে, প্রসব বেদনায় আক্রান্ত কোন মহিলা এদের প্রতি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবে, পরে নক্‌শাগুলি পদদলিত করবে; তাহলে অবিলম্বে বিনা কষ্টে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। এসব স্থবির বুদ্ধির লোকেরা এর সম্ভাব্যতাকেও বিশ্বাস করে, তাদের মস্তিস্কে একথা কেন ঢোকে না যে, ইবাদতের কল্যাণও অনুরূপভাবে স্বীকার করা উচিত। তাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, ফজরের দুই রাকা'আত, যোহরের চার রাকা'আত এবং মাগ্‌রিবের তিন রাকা'আত, প্রভৃতি নামাযে গাণিতিক বিভিন্নতার মাঝে মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আর এ কল্যাণের খবর কেবল নুবূওতের সাহায্যেই অবগত হওয়া যেতে পারে। অন্য কোনভাবে জানা সম্ভব নয়। ব্যাপারটি বুঝাবার যত চেষ্টাই আমরা করি যে, নামাযের সংখ্যায় গাণিতিক পার্থক্য সম্পর্কিত উপকারিতা-এর সময়ের বিভিন্নতার সাথে সম্পৃক্ত; কিন্তু এ তাদের উপলব্ধিতে আসবে না এবং তারা একে অবৈজ্ঞানিক বলে আখ্যায়িত করবে।

পক্ষান্তরে, আমরা যদি বলি, মধ্যাহ্ন-সূর্য, অস্তাচলগামী-সূর্য এবং অস্তগামী-সূর্য প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া আছে, তবে তারা তা স্বীকার করবে। শুধু তাই নয়, তারা এর ভিত্তিতে তাদের জীবনপঞ্জি রচনা করে এবং জীবন-মরণের ভবিষ্যদ্বাণীও করে। কিন্তু এই একই কথা নামাযের ব্যাপারে বললে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু এর যৌক্তিকতা কি? তারা

[৭৩] নক্‌শাগুলি এরূপ : উপরোক্ত নক্‌শাগুলি আগের খন্ডে উল্লেখ ছিল না। এগুলি 'কুন্দিয়া-ওয়ালা' খন্ড থেকে বর্ণনা করা হলো। এ নক্‌শাগুলি ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) কর্তৃক রচিত গ্রন্থ 'আল-মুনকেযু মিনাদ্দলাল" গ্রন্থেও কিছু পার্থক্যসহ বর্ণিত আছে। এর বৈশিষ্ট হলোঃ এ নক্‌শায় নয়টি ঘর আছে এবং সেখানে বিশেষ-বিশেষ সংখ্যা লিখিত আছে, যার যোগফল-দৈর্ঘ্য ও কোনাকুনিভাবে ১৫ (পনের)।

পরীক্ষিত মিথ্যাবাদী জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করে, অথচ মিথ্যার অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র নবীগণের কথা তারা বিশ্বাস করতে চায় না।

তারা মিথ্যাবাদী জ্যোতিষীদের প্রতি গভীর আস্থাশীল। তারা যদি বলে যে, সূর্য যখন মধ্যাহ্ন আকাশে আসে এবং অমুক তারকা এর সামনা-সামনি হয়, তখন তোমরা নতুন কাপড় পরিধান করবে না কেননা, এরূপ করলে তুমি মারা যাবে। একথা তৎক্ষণাৎ লোকেরা বিশ্বাস করবে এবং প্রচণ্ড শীতে জর্জরিত হলেও তারা তখন নতুন কাপড় পরতে রাজী হবে না। কারণ, তারা বিশ্বাস করে যে, এতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। কিন্তু নবীগণের 'মু'জিযা' বা অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা বললেই তারা বিগড়ে যায় এবং তাদের মস্তিস্কে এ প্রবিষ্ট হয় না যে, যে কোন অজ্ঞাত কারণে এসব অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে।

একইভাবে দর্শন শাস্ত্রের ভক্তরা মানতে রাযী যে, ঔষধের ক্রিয়া হয় এবং নক্ষত্রের গতিবিধি মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু নামাযের রাকা'আতের সংখ্যাগত পার্থক্য, হাজীদের প্রস্তর নিক্ষেপ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও যে অর্থহীন নয়, একথা মানতে তারা আদৌ রাযী নয়।

বস্তুত, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই; বরং উভয়ের মাঝে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। তবে কেউ এরূপ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, ঔষধ ও নক্ষত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি এবং তাদের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাই আমরা এদের প্রভাবকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু নুবূওত সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাই, বিনা প্রমাণে কি করে আমরা এগুলো স্বীকার করবো?

এর জবাবে আমার বক্তব্য হলো : তোমাদের এ দাবী সত্য নয়। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তোমরা ডাক্তার ও জ্যোতিষীর কথায় বিনা প্রমাণে ও পরীক্ষায় আস্থা স্থাপন কর এবং অনুরূপভাবে তাদের কথা বিশ্বাস কর। এমতাবস্থায় নুবূওত সংক্রান্ত ব্যাপারে নবীদের কথায় আস্থা স্থাপন করা অযৌক্তিক হবে কেন? নবীগণ তো নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এগুলোর বাস্তবতা ও যথার্থতা উপলব্ধি করেছেন। তাই, তাদের অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে এদের অন্তর্নিহিত কল্যাণের সন্ধান নিঃসন্দেহে পাওয়া যেতে পারে।

এখন আল্লাহর ওলীদের কথা শ্রবণ করো, যারা শরীয়তের সমস্ত হুকুম-আহকাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন এবং হক বা বাস্তব সত্যকে অন্তর-চক্ষু দিয়ে অবলোকন করেছেন। তোমরা এদের রাস্তা অনুসরণ কর, তাহলে কিছু কিছু ব্যাপার অনুধাবন করতে পারবে। এছাড়া আমি আরো বলবো : যদিও তোমরা এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করোনি, কিন্তু তোমাদের সত্য ও বাস্তব জ্ঞান তোমাদেরকে এসব স্বীকার করতে এবং অনুসরণ করতে দাবী করে। যেমন ধরে

নেওয়া যাক, এক ব্যক্তি জ্ঞানী, বালেগ এবং বুদ্ধিমান; কিন্তু সে তার জীবনে কোন দিন অসুখে ভুগেনি, এখন সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। আর তার পিতা আছে, যে তার প্রতি খুবই স্নেহ পরায়ণ এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক। এখন যদি তার পিতা তার রোগের জন্য কোন ঔষধ নির্ধারণ করে বলে : বাবা, এ ঔষধ তোমার রোগের জন্য উপকারী এবং এ তোমার রোগকে সারাতে সাহায্য করবে। এ সময় তার জ্ঞান তাকে ঐ ঔষধ পান করতে উদ্বুদ্ধ করবে, যদিও সে ঔষধ হয় তিক্ত এবং অরুচিকর। কিন্তু এ সময় যদি সে পিতার কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে বলে : এ ঔষধে যে আমার রোগ ভাল হবে, আমার 'আক্ল' বা 'জ্ঞান' সেরূপ সিদ্ধান্ত দিচ্ছে না; আর আমি তো ইতিপূর্বে এ ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিনি, তাই আমি এ ঔষধ সেবন করবো না। এমতাবস্থায়, তুমিও অবশ্য তাকে 'আহমক' বা বোকা বলে ঠাওরাবে।

বস্তুতঃ এখন যদি তুমি এরূপ প্রশ্ন কর যে, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্নেহ এবং তিনি যে বিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন, তা কিরূপে জানবো? এর জবাবে আমার বক্তব্য হলো : তুমি তোমার পিতার স্নেহ কিভাবে বুঝলে? পিতার অপত্য স্নেহ তো কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নয়। বরং তুমি তোমার পিতার অপত্য স্নেহ, তোমার জীবনের প্রতি পদে পদে যে পেয়েছ, তা তার প্রতিটি কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে অবশ্যই তোমার কাছে স্পষ্ট, যার মধ্যে তোমার সামান্য পরিমাণ কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

এক্ষণে, যে ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথাবার্তা এবং তাঁর আচার-আচরণের প্রতি অনুধাবন করবে, যা তাঁর তরফ থেকে বর্ণিত আছে; সে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, তিনি পথভোলা, গোমরাহ মানুষদেরকে হিদায়াত ও কল্যাণের দিকে আহবান করার জন্য কত স্নেহ-পরায়ণ হয়ে, শত কষ্ট ও যুল্‌ম বরদাশ্‌ত করে, কিরূপে তাদেরকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর এ আচরণের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পুত্রের প্রতি পিতার যে অপত্য স্নেহ, তার চাইতে অনেক বেশী স্নেহ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাঁর উম্মতের প্রতি।

এতদ্ব্যতীত, তাঁর জীবনের আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক বিষয়ের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, যা তাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। তবে তো বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। এ সমস্ত ব্যাপার বা ঘটনা তাঁর জবানে কোরআন মজীদে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া ঐসব ঘটনার প্রতি দৃকপাত করলেও বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়, যা তাঁর তরফ থেকে 'আখেরী-যামানা' বা শেষ-যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে প্রকাশিত হয়েছে। সেসব ভবিষ্যদ্বাণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি যা ইরশাদ করে গেছেন, বাস্তবে তা-ই সংঘটিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা এবং তার প্রকাশ-কোন ব্যক্তির পক্ষে তার জ্ঞানের

দ্বারা জানা বা বুঝা আদৌ সম্ভবপর নয়। কাজেই, জানা গেল যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সম্মানিত সাহাবীদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হলো এটি; কেবল মানবিক জ্ঞানের দ্বারা এসব হাসিল করা সম্ভব নয়।

এখন যদি তুমি কোরআন মজীদ গভীরভাবে অধ্যয়ন কর এবং এসব ঘটনাকে পর্যালোচনা কর, তাহলে দেখতে পাবে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নুবূওতের দাবী কত সত্য এবং বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে কোনরূপ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই; বরং দিবালোকের মত চির উজ্জল ও ভাস্বর।

ইমাম গায্যালী (রহ.) ব্যাপারটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি সন্দিহান হও যে, সে নবী কি-না? এমতাবস্থায় তুমি সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান কেবল এভাবে লাভ করতে সক্ষম হবে যে, সে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন পদ্ধতির জ্ঞান চাই তা মুশাহিদার দ্বারা জ্ঞাত হউক বা সঠিক বর্ণনা পরম্পরার দ্বারা। কেননা, যখন তুমি চিকিৎসা ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান আয়ত্ত্বে আনতে সক্ষম হয়েছ, তখন তুমি এ জ্ঞানের দ্বারা চিকিৎসক ও ফকীহদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত হতে পারবে। যদিও তাদেরকে স্বচক্ষে দেখা তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়। আর এভাবে বলা যায় যে, ইমাম শাফী (রহ.) যে ফকীহ্ ছিলেন এবং জালিয়ানুস যে হাকীম বা চিকিৎসক ছিলেন-তা জানা তোমার জন্য আদৌ মুশ্কিলের ব্যাপার নয়। এরূপ জ্ঞানকে-বাস্তব জ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, এ জ্ঞান অন্ধ অনুকরণ সজ্ঞাত-জ্ঞান নয়। বরং যদি তুমি ফিকাহ শাস্ত্রের বা চিকিৎসা বিদ্যার কিছু জ্ঞান সঞ্চয় কর এবং তাদের বই-পুস্তক অধ্যয়ন কর, তবে অবশ্যই তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারবে।

আর এভাবে, যখন তুমি নুবূওতের তাৎপর্য অনুধাবন করতে চাইবে, তখন তোমাকে কোরআন ও হাদীস গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। তাহলে তুমি অবশ্যই জানতে পারবে যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুবূওতের সর্বোত্তম মর্যাদায় বিভূষিত ছিলেন। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আমল, অজীফা, ইবাদাত ও আত্ম-শুদ্ধির তা'লীম ও তারবিয়াতের পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাঁর নুবূওতের দাবী বাস্তবতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তিনি তাঁর কথায় কত সত্যবাদী ছিলেন। যেমন-তিনি ইরশাদ করেছেন : যারা তার উপর আমল করে, যা তারা জানে, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে জিনিসের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করে দেন, যা তারা জানে না।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ বাণীও কত সত্য : যে ব্যক্তি কোন যালিমকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা সে যালিমকে তার উপর আধিপত্য দান করবেন। তাছাড়া হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একথাও কত বাস্তবঃ যে ব্যক্তি এভাবে প্রাতঃকালে উপনীত হলো যে, তার মনে কেবল একই চিন্তা,[৭৪] আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা সমূহের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

এভাবে যখন তুমি এসব উক্তিগুলির বাস্তবতাকে হাজার-হাজার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে তখন তুমি নিশ্চিত হবে যে, এতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। কাজেই, নুবূওতের বাস্তবতাকে এভাবেই অন্বেষণ কর। এর দ্বারা তোমার ঈমান মজবুত হবে। এখন অবশিষ্ট থাকলো অনুভূতি দিয়ে নুবূওতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার ব্যাপারটি, যাকে মুশাহাদা বলা হয় তা পাওয়া যাবে সুফীদের তরীকা গ্রহণের মাধ্যমে।

ইছ্বাতুন্ নুবূওতের বিভিন্ন পদ্ধতি

'উলামাগণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবূওতের-প্রমাণ দান করার জন্য কয়েকটি দলীল পেশ করেছেন :

(১) প্রথম দলীল, যা অধিকাংশ 'আলেমের নিকট খুবই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য, তাহলো : হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুবূওতের দাবী করেন এবং তাঁর হাত থেকে মু'জিযাও প্রকাশিত হয়। প্রথম কথা যা হলো নুবূওতের দাবি, এতো বর্ণনা পরস্পরায় গ্রথিত এবং সে বর্ণনা পরস্পরার ধারা এমনই মজবুত সূত্রে গ্রথিত, যা নিজেদের চোখে-দেখার সমতুল্য। কাজেই, এতে অবিশ্বাসের কোন অবকাশ নেই। আর দ্বিতীয় কথা, যা হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মু'জিযা। আল-কোরআন এজন্যই মু'জিযা যে, তিনি তা দিয়ে চ্যালেঞ্জ (Challenge) পেশ করেন; আর সে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে কেউ-ই সক্ষম হয়নি। আর সেজন্যে-ই আল-কোরআন মু'জিযা এবং জীবন্ত মু'জিযা, যার মুকাবিলা অদ্যাবধি দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষে করা আজও সম্ভব হয়নি, তা ঐ লাগাতার বর্ণনা পরস্পরা সূত্রের মত, যার মাঝে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

আল-কোরআনুল কারীমের মাঝে এমন অসংখ্য আয়াত আছে, যদ্দারা অবিশ্বাসীদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার এ বাণী : فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ

"তারা যেন এর অনুরূপ কথা নিয়ে আসে"।[৭৫]

---

[৭৪] অর্থাৎ আল্লাহর চিন্তা

[৭৫] আল-কোরআন, ৫২ : ৩৪;

আরো আল্লাহর বাণী : فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ- "তোমরা এর (আল-কোরআনের) অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে আনো"।[৭৬] এছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরো ইরশাদ : فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ "তোমরা এর অনুরূপ একখানি সূরা নিয়ে এসো"।[৭৭]

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো : এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা সে যুগে কেউ করতে সক্ষম হয়নি এবং আজও নয়। কাজেই, আল্-কোরআনের এই মু'জিযা চ্যালেঞ্জরূপে সর্বযুগে ও সর্বকালে বিদ্যমান। এ ব্যাপারে সংশয়ের বিন্দুমাত্র কোন অবকাশ নেই। কোরআন যে যুগে নাযিল হয় সে যুগে আরবে আরবী সাহিত্যের বড় বড় বিজ্ঞ-জ্ঞানী, গুণী, কবি ও ভাষাবিদ বিদ্যমান ছিল, যারা আল্-কোরআনের বিরোধিতার জন্য তাদের জান মাল অকাতরে বিলিয়েও দিয়েছিল; কিন্তু আক্ষেপ! তারা আল-কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা তৈরী করে এনে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং একথা অবিসংবাদিতরূপে সত্য যে, তারা যদি ভাষার মুকাবিলার মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হতো, তবে তারা এর বিরোধিতার জন্য নিজেদের এবং তাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানদের জান-মাল উৎসর্গ করতো না, বরং ভাষা দিয়ে এর মুকাবিলা করতো! আর যদি তারা এ কাজটি করতে সক্ষম হতো, তবে সে খবরও-নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা পরম্পরা সূত্রে অবশ্যই আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতো। কাজেই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তারা আল-কোরআনের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা সে যুগেও করতে পারেনি, যেমন পারছেনা এ যুগেও কেউ এবং তা পারা কোন মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না (সুবহানাল্লাহ)।

উপরোক্ত আলোচনার সূত্রে নিঃসন্দেহে এ মন্তব্য করা যায় যে, যার চ্যালেঞ্জ করা হলো, আর সে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে কেউ যখন সক্ষম হলো না- কাজেই তা মু'জিযা। এ ব্যাপারটি "মু'জিযার হাকীকাত এবং তার শর্তাবলী" অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

অবশ্য এ বিষয়টির উপর কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমন-১. এরূপ বলা যেতে পারে যে, হয়তো এ চ্যালেঞ্জ তাদের কাছে পৌঁছায়নি, যারা এর মুকাবিলা করতে সক্ষম ছিল; ২. অথবা মু'জিযার দাবীদারের পক্ষ হতে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রাপ্তির কারণে তারা তাঁর অনুকূলে সমর্থন দেয় এবং বিরোধিতা পরিহার করার কারণে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করেনি; অথবা এও কারণ ছিল যে, প্রথমে তারা এটাকে সাধারণ ব্যাপার হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং মনে করেছিল যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নুবূওতের দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে না, পরবর্তীতে তারা তাঁর

---

[৭৬] আল-কোরআন, ১১ : ১৩

[৭৭] আল-কোরআন, ২ : ২৩

শান্-শওকত ও অসংখ্য, অগণিত ভক্তবৃন্দের ভয়ে শংকিত হয়ে বিরোধিতা পরিহার করে; কিম্বা জীবন যাত্রার স্বচ্ছলতার অভিপ্রায়ে কোরআনের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করা থেকে বিরত থাকে; ৩. অথবা এও হতে পারে যে, চ্যালেঞ্জের মুকাবেলা করা হয়েছিল, কিন্তু কোনরূপ নিষেধাজ্ঞার কারণে তা প্রকাশ পায়নি, অথবা তা প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী ও অনুসারীদের প্রভাব ও দাপটের ফলে তা গোপন রাখা হয়েছিল, এমনকি তার চিহ্ন পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়ে তা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল।

এসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব হলো তা, যা আগেই দেওয়া হয়েছে। আর কেবল ধারণার দ্বারা কোন বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করা সমীচিন নয়। তবুও উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের জবাব এখানে বিস্তারিতভাবে পেশ করার চেষ্টা করা হলো :

"হয়তো চ্যালেঞ্জ সে লোকদের কাছে পৌঁছায়নি, যারা এর জবাব দানে সক্ষম ছিল"। এ বক্তব্যের জবাবে বলা যেতে পারে যে, নুবূওতের দাবীদার যদি এরূপ কিছু নিয়ে আসে, যা তাঁর দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে এবং তিনি তা দিয়ে চ্যালেঞ্জও প্রদান করেন, কিন্তু লোকেরা সে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়; তখন এর দ্বারা যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা এই যে, নবী তাঁর নুবূওতের দাবীতে সত্য। আর একে অস্বীকার করা নিছক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুই : "প্রথমতঃ লোকেরা এ ব্যাপারটিকে সাধারণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিল, পরে তারা তাঁর শান্-শওকত ও অসংখ্য অগণিত সাহাবীদের ভয়ে শংকিত হয়ে, তাঁর বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকে"। এ ধরনের উক্তির জবাবে বলা যেতে পারে যে, সাধারণতঃ দেখা যায় যে, লোকেরা সে ব্যক্তির বিরোধিতায় তৎপর হয়, যে কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হয়; যদ্বারা তাঁর সমকালীন লোকদের উপর তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া সে লোকদের জান ও মালের ব্যাপারেও হুকুম জারী করতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তি এ রকমের অভিযোগ করতে পারে না যে, সে ব্যক্তির বিরোধিতা বা মুকাবিলা আদৌ করা সম্ভব হবে না; বরং করা সম্ভব, কেননা তার এ দাবী সে শক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। পক্ষান্তরে, নবীদের নুবূওতের দাবী এমনই একটি স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার যাকে প্রতিহত করা বা তাঁর অলৌকিক কর্মকাণ্ডের মুকাবিলা করা, আদৌ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই, এর দ্বারা যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলো : নুবূওতের দাবীদারের দাবী সত্য এবং বাস্তব, এবং তিনি যেসব মু'জিযা পেশ করেন, তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতে করে থাকেন।

তিন : "সে মু'জিযার মুকাবিলা করা হয়েছিল, কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে তা প্রকাশ পায়নি"। এ বক্তব্যের জবাবে বলা যেতে পারে যে, সাধারণ নিয়মানুসারে জানা যায় যে, কারো শক্তিকে স্বীকার করে নিলেও, যদি কোন কাজে-কারবারে তার বিরোধিতার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা করা উচিত। একইভাবে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দেখা যায় যে, সে মুকাবিলা বা বিরোধিতা প্রকাশ পাওয়া দরকার কেননা, তদ্বারা মাকসুদ হাসিল হয়ে থাকে। আর কোন সময়, কোন ব্যাপার বা বিষয় প্রকাশ না হতে পারার অর্থ এই নয় যে, সে বিষয়টি আর কখনো প্রকাশ পেতে পারবে না; বরং যে প্রতিবন্ধকতার কারণে সেটি প্রকাশ হতে পারছিল না, তা তিরোহিত হবার পর সেটি প্রকাশ পেতে আপত্তি কি?

বস্তুত, মু'জিযার মুকাবিলা যদি করা হয়েই থাকে, তবে তা গোপন রাখা কখন-ই সম্ভব নয়; সেটা নুবূওতের দাবীদারের সাথীদের প্রাধান্য প্রাপ্তি ও বিজয়ী হবার সময়ও সম্ভব নয়; আর এছাড়া অন্যদের পক্ষে তা গোপন রাখার কোন প্রশ্ন-ই তো আসে না। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃ জানা গেল যে, যে ধরনের সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে, নবী ও নুবূওতের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে তা অবাস্তব এবং বাতিল। কাজেই, নবীদের নুবূওত যে সত্য, তা অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হলো।

আল-কোরআনের ই'জাযের[৭৮] প্রমাণ

স্মর্তব্য যে, মুতাকাল্লিমীনরা[৭৯] ই'জাযে-কোরআনের ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করেন। তাদের কারো কারো অভিমত যে, আল্-কোরআনের বাগ্‌ধারা ও বাক্য বিন্যাস পদ্ধতি অত্যন্ত মনোরম ও চমৎকার, যা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য পদ্ধতির বিপরীত। সাধারণতঃ এ অভিনব পদ্ধতি কিস্‌সা ও সূরাগুলির প্রথমে এবং শেষে দেখা যায়; তাছাড়া আরবী ভাষার মধ্যে যে ছন্দের মিল পরিলক্ষিত হয়, আল্-কোরআনে তা এমন ভাবে বিধৃত হয়েছে যে, যার সাথে আরবী সাহিত্যের কোন নযীর খুজে পাওয়া যায়না, বরং তারা এর মুকাবিলা করতে অক্ষম। কোন কোন মু'তাযিলার অভিমতও এরূপ।

জাহেয্ মুতাযেলী এবং আহলে আরবদের অভিমত হলো : আল্-কোরআনের বালাগাত বা ভাষার অলঙ্কার এত উঁচু স্তরের ও উন্নতমানের যে, যার নযির আরবী-ভাষা সাহিত্যের বাক্য বিন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায়না। আরবী ভাষার বালাগাত, আল-কোরআনের বালাগাতের সমকক্ষ নয়। বস্তুত যে ব্যক্তি

[৭৮] অলৌকিকত্ব, বিস্ময় ।

[৭৯] যারা কালাম বা যুক্তি বিদ্যায় অভিজ্ঞ; দার্শনিকগণ।

আরবী ভাষা ও তার অলঙ্কার শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হবে, সে আল্-কোরআনের ই'জায সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। কাযী বাকেলানী বলেন : আল্-কোরআনের ই'জায দু'টি বিষয়েই পরিলক্ষিত হয়; যথা :-১. বর্ণনা ভঙ্গীর অপূর্বতায় এবং ২. উঁচু স্তরের অলঙ্কারময় শব্দ বিন্যাসে; যা আরবী সাহিত্যে সাধারণতঃ দেখা যায় না। আবার কেউ কেউ বলেন আল্-কোরআনের ই'যাজ এজন্য যে, তাতে গায়েব বা অদৃশ্য জগতের খবর সন্নিবেশিত আছে। যেমন :

وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ. فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ.

অর্থাৎ "তারা এদের বিজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তাদের উপর বিজয়ী হবে "।[৮০]

উপরোক্ত আয়াতে এ খবর দেওয়া হয়েছে যে, রোমকগণ-ইরানীদের উপর তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। আর ব্যাপারটি সেরূপই হয়েছিল, যেমন আল্-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।

কিছু কিছু জ্ঞানীর নিকট আল্-কোরআন এজন্য ই'জায যে, তার মধ্যে যা কিছু বিধৃত হয়েছে, এর মাঝে কোন মতানৈক্য ও বৈপরীত্য নেই; যদিও তার বর্ণনাধারা অনেক দীর্ঘ ও লম্বা। যেমন আল্-কোরআনের দলীল :

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

অর্থাৎ "যদি এই কোরআন আল্লাহ ছাড়া আর কারো তরফ থেকে হতো, তবে এর মধ্যে অসংখ্য মতানৈক্য, মতভেদ দেখতে পেতো"।[৮১] কারো কারো মতে আল্-কোরআন এ কারণে ই'জায যে, তা সারাফার উপর প্রতিষ্ঠিত; আর সারাফা' বলা হয় : হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বি'ছাতের আগে আরবেরা কোরআনের অনুরূপ বাক্য বিন্যাসে সমর্থ ছিল; কিন্তু আল্-কোরআন নাযিল হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে এ সামর্থ ছিনিয়ে নেন; ফলে তারা তার মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাদের এ সামর্থ্য ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি কিরূপ ছিল, তন্মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। উস্তাদ আবু ইসহাক্ (যিনি আহলে সুন্নাহ ওয়াল্ জামাআতের অন্তর্ভুক্ত) ও নিযাম মুতাযেলীর অভিমত হলো : আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মধ্যে আল্-কোরআনের অনুরূপ আয়াত তৈরীর শক্তি থাকা সত্ত্বেও, তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখেন। আর তা এভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে নীচতা ও হীনমন্যতার ভাব সৃষ্টি করে দেন; ফলে, তাদের মাঝে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা মনে করতো যে, আমরা আল্-কোরআনের মুকাবিলা ও বিরোধিতা করতে অক্ষম। মুরতাযা নাম্নী একজন শিয়া আলেমের অভিমত হলো : বরং আল্লাহ তা'য়ালা তাদের থেকে

[৮০] আল-কোরআন, ৩০ : ৩-৪ আয়াত

[৮১] আল-কোরআন; সূরা নিসা, আয়াত : ৮২।

ঐসব ইল্‌ম 'সল্‌ব' করেন বা কেড়ে নেন, যে জ্ঞান মুকাবিলা করার জন্য বা বিরোধিতার জন্য প্রয়োজন হয়।

আল্‌-কোরআনের ই'জাযের ব্যাপারে যারা সমালোচনা করেন, তাদের কিছু সন্দেহ ও অভিযোগের পর্যালোচনা :

প্রথমতঃ আল্‌-কোরআন ই'জায হওয়ার জন্য জরুরী যে, তা ঐ ব্যক্তির জন্য স্পষ্ট বা প্রকাশ্য হবে যে, তা থেকে দলীল পেশ করবে। আর এ ব্যাপারে তোমাদের মতানৈক্য এটাই প্রমাণ করে যে, তা ঐ ব্যক্তির জন্য স্পষ্ট নয়।

এরূপ অভিযোগের জবাব হলো : যদিও কোন কারণবশঃ আল্‌-কোরআনের কোন কোন স্থানে মতানৈক্য অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু আসলে কোরআনের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য ও অস্পষ্টতা নেই। কারণ, এটা স্পষ্ট যে, গোটা কোরআনুল কারীম যে ভাষার অলঙ্কারে ও বিশেষ-ভংগীতে গায়েবের খরবসহ নাযিল হয়েছে এবং ইল্‌ম ও আমলের দিক থেকে যেরূপ হিকমাতে পরিপূর্ণ, তা অপূর্ব ও চিরবিস্ময়কর। তাছাড়া আল্‌-কোরআনের ই'জায হওয়ার ব্যাপারে ইতিপূর্বে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, এসব দিক গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, কোরআনুল কারীম মু'জিযা।

আল্‌-কোরআনে আপাততঃ যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়, তা দৃষ্টিভংগীর পার্থক্যের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। অথবা যারা এ ব্যাপারে মত পার্থক্য করেছেন, তাদের জ্ঞানের সীমিত পরিধির কারণে করেছেন। কথাটা এরূপ নয় যে, বিবৃত কোন কারণ সমূহের বিশেষ কোন কারণে যদি আল্‌-কোরআন মু'জিযা না হয়, তবে এর দ্বারা এরূপ মনে করা সঙ্গত হবে না যে, গোটা কোরআন-ই মু'জিযা নয়। কাজেই একটি বিশেষ কারণের দ্বারা আল্‌-কোরআনকে মু'জিযা নয়, এরূপ ধারণা করা আদৌ উচিত হবে না। যেমন এরূপ বহু ভাষা অলঙ্কারবিদ আছেন, যিনি গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে সমান দক্ষ; কিন্তু এছাড়া ভাষার অন্যান্য অঙ্গনে তিনি পারদর্শী নন। কাজেই, এক্ষেত্রে যেমন বলা যায় না, তিনি সর্বক্ষেত্রে সমান পারদর্শী হবেন; তেমনি একথা বলা উচিত হবেনা যে, যা একজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-তা অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সঙ্গত হবে।

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো : তোমাদের কথায় এরূপ বুঝা যায় যে, কেবল আল্‌-কোরআনের সমষ্টি মু'জিযা; কিন্তু এর কোন কোন ছোট সূরা মু'জিযা নয়। এরূপ ধারণা বাস্তবতার পরিপন্থী। কেননা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্‌-কোরআনের একটা ছোট সূরাও মু'জিযা, যারা মুকাবিলা করতে তৎকালীন কবি সাহিত্যিকরা অক্ষম ছিল।

এ বক্তব্যের জবাবে যদি তোমরা বল : জবাব দাতার জওয়াবে জানা গেল যে, আল্‌-কোরআন তার মধ্যে বর্ণিত সমস্ত ই'জাযের কারণে-মু'জিযা এবং তার

প্রত্যেকটি সূরা-ই'জাযের কোন একটি অনির্দিষ্ট কারণের জন্য মু'জিযা। এর জবাবে আমি বলবো : এমতাবস্থায় অভিযোগকারীর অভিযোগ দূরীভূত হবেনা; কেননা, তার ধারণা হলো-ই'জাযের জন্য এটি জরুরী যে, তা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হতে হবে। আর এরূপ হলে ই'জাযের কারণ স্পষ্ট থাকে না। যেমন তুমি তা নিজেই অনুধাবন করতে পার।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ থেকে হিফাযাত করুন, যারা এরূপ ধারণা করে যে, আল্-কোরআন স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নয়। যারা বিশেষ কোন মত ও পথের অনুসারী না হয়ে, ইনসাফের সাথে আল্ কোরআনকে পর্যালোচনা করবে, তারা স্পষ্টতঃ জানতে পারবে যে; এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা করা প্রকাশ্য গোম্‌রাহী ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাদের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো : সাহাবায়ে কিরাম আল্-কোরআনের কোন কোন অংশ নিয়ে মতভেদ ও মতানৈক্য করেছেন। এমনকি হযরত ইব্‌নে মাস'উদ (রা.) বলেছেন : সূরা ফাতিহা এবং মুআব্‌বেযাতায়েন[৮২] আল্-কোরআনের অংশ নয়; যদিও এগুলি আল্-কোরআনের মশ্‌হুর সূরাগুলোর অন্যতম। যদি এ সূরাগুলির 'বালাগাত' বা ভাষার অলঙ্কার ই'জাযের স্তরে পৌঁছতো, তবে এগুলি, যা কোরআন নয়-তা থেকে আলাদা হতো, এবং তারা (সাহাবীগণ) এ ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করতেন না।

এর জবাব হলো : সাহাবীদের মতভেদ আল্-কোরআনের এমন কিছু সূরার ব্যাপারে যা, খবরে 'আহাদ'[৮৩] দ্বারা বর্ণিত; এবং 'খবরে আহাদ' যন বা ধারণার সৃষ্টি করে। কিন্তু গোটা বা সমস্ত কোরআন 'তাওয়াতুর'[৮৪] এর দ্বারা বর্ণিত; যা 'ইয়াকীন' বা দৃঢ় বিশ্বাসকারী। সুতরাং এ 'খবরে আহাদ' আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

উপরন্তু আমরা একথাও বলতে পারি যে, তারাতো এ ব্যাপারে মতভেদ করেননি যে, এ কোরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়নি; আর এ ব্যাপারেও তারা মতানৈক্য করেননি যে, আল্-কোরআনের এসব সূরা ই'জাযের স্তরেও পৌঁছতে পারেননি। বরং তারা কেবল এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন যে, এ সূরাগুলি কি কোরআনের অংশ বা অংশ নয় তা নিয়ে। আর এ বিষয়টি আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুতে কোনরূপ বিরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম নয়।

---

[৮২] সূরা ফালাক এবং সূরা নাসকে এক সংগে 'মুআব্‌ বেযাতায়েন' বলা হয়।

[৮৩] যে হাদীসের সনদের বর্ণনার কোন এক পর্যায়ে রাবী বা বর্ণনাকারী মাত্র একজন-থাকে, তাকে 'খবরে আহাদ' বলে।

[৮৪] যে হাদীসের সনদের বর্ণনার প্রতিটি পর্যায়ে অসংখ্য রাবী বিদ্যামান, তাকে 'খবরে মুতাওয়াতির বা তাওয়াতুর বলে।

তাদের তৃতীয় অভিযোগ হলো : যখন আল্-কোরআন সংগ্রহ ও সংকলন করা হয় তখন এমন কোন ব্যক্তি-যিনি বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে তাদের কাছে মাশ্হুর বা প্রসিদ্ধ ছিলেন না, তিনি যখন কোন আয়াত নিয়ে আসতেন, তখন তাকে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য বা কসম ব্যতিরেকে-কোরআনের মধ্যে গ্রহণ করা হতো না। যদি আল্-কোরআনের 'বালাগাত' বা ভাষার অলঙ্কার ই'জাযের স্তরে উন্নীত হতো, তবে তাকে তার দ্বারা চিনে নিত এবং কোরআনের মধ্যে শামিল করে নিত; এমতাবস্থায় বিশ্বস্ত হওয়া, সাক্ষী পেশ করা বা কসম করার কোন প্রয়োজন পড়তো না।

এর জবাব হলো : তাদের এ মতানৈক্য ছিল আল-কোরআনে আয়াতের স্থান নির্ধারণ এবং কোন্ আয়াত আগের বা কোন্ আয়াত পরের-সে সম্পর্কিত। ঐ আয়াত যে আল্-কোরআনের নয়, তা নিয়ে তাদের কোনরূপ মত পার্থক্য ছিল না। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় কোরআন পাঠ করতেন; তাই, যখন কেউ কোন আয়াত নিয়ে আসতো, তখন তা যে আল্-কোরআনেরই অংশ তা নিশ্চিত ছিল; তবে সাক্ষী পেশ বা কসম করার ব্যাপারটি ছিল কেবলমাত্র বর্ণনা ধারার অক্ষুন্নতার কারণে। কাজেই, জানা গেল যে, এ ব্যাপারে কোন সমস্যাই নেই। তাছাড়া, একটি বা দু'টি আয়াত যদি মু'জিযা না হয়, তা আমাদের কাছে কোন সমস্যার ব্যাপার নয় কেননা; আল্-কোরআনের জন্য ই'জায হওয়া জরুরী এবং অতীব প্রয়োজন; তাই সেটা একটি ক্ষুদ্রাকৃতি সূরার আকারেই হোক, বা কোন সূরার কম থেকে কম তিন আয়াতই হোক।

তাদের চতুর্থ অভিযোগ হলো : প্রত্যেক শিল্পের একটি নির্ধারিত সীমা-পরিসীমা আছে। যার উন্নতি সেখানে গিয়ে থেমে যায় এবং সে সীমা আর অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। আর প্রত্যেক যুগে এমন একজন লোকের অস্তিত্বের প্রয়োজন, যিনি যুগের সব কিছুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম। সুতরাং সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, সম্ভবতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সমকালীন লোকদের মাঝে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন, এবং তিনি এমন 'কালাম বা কথা পেশ করেন, যার মুকাবিলা করতে তাঁর যুগের লোকেরা অক্ষম ছিল। যদি তাঁর এ কালাম মু'জিযা হয়, তবে মনে করা যেতে পারে যে, যে এ ধরনের কিছু পেশ করবে, যদ্দরুন সে তার সমকালীন লোকদের মাঝে সে শিল্পে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হবে, তবে তাও মু'জিযা হয়ে যাবে। আর এটা প্রকাশ্য যে, এরূপ ধারণা করা বাতুলতা বই কিছুই নয়।

এর জবাব হলো : স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রত্যেক যুগে মু'জিযা এমন ব্যক্তি থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যিনি তা দিয়ে তার সমকালীন যুগের লোকদের

উপর বিজয়ী হয়েছেন। যদিও সে যুগের লোকেরা উন্নতির এমন চরম শিখরে আরোহন করেছিল, যে পর্যন্ত পৌঁছানো কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু যখন তারা দেখলো যে, তারা যে শিল্পের স্বর্ণ-শিখরে আরোহন করেছেন, নবী-রাসূলগণ যা নিয়ে আগমন করেছেন, তা তাদের শিল্প চাতুর্যের সীমা-সরহদ পেরিয়ে আরো উপরের স্তরে গিয়ে পৌঁছছে; তখন তারা বিশ্বাস করে নেয় যে, এটা আল্লাহ সুবহানুহুর তরফ থেকে এসেছে। আর যদি এরূপ না হতো, তবে কাওমের কাছে নবীর মু'জিযা প্রতিষ্ঠিত হতো না।

যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সময় যাদুর চর্চা ও রেওয়াজ সব চাইতে বেশী ছিল। আর যাদুকররা একথা ভালভাবেই জানতো যে, যাদু ভেল্‌কীবাজী ও নযরবন্দী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই, যখন তারা দেখলো যে, হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠি সাপে পরিণত হলো এবং তাদের যাদুর তৈরি সব হাতিয়ারগুলোকে গিলে ফেলল, তখন তারা বুঝতে পারলো যে, এটা যাদু নয় এবং মানুষের শক্তির বাইরে অন্য কোন শক্তি। যার ফলশ্রুতিতে তারা মূসা (আ.)-এর উপরে ঈমান আনে। কিন্তু ফিরাউন এ সত্যক প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, মূসা তাদের বড় উস্তাদ, যার থেকে এরা যাদু শিখেছিল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এ উদাহারণ প্রযোজ্য। হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে এর প্রাধান্য ছিল। আর এ বিদ্যায় সে যুগের লোকেরা চরম উন্নতি সাধন করেছিল। কিন্তু তারা জানতো যে, মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে চক্ষু দান করা এবং কুষ্ঠ রোগীকে, সুস্থ করা চিকিৎসা বিদ্যার দ্বারা সম্ভব নয়; বরং এসব আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সম্ভব। কাজেই হযরত ঈসা (আ.) যখন মৃতকে জীবিত করে দেখান, জন্মান্ধকে চক্ষুস্মান করে তোলেন এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করেন, তখন তারা তাঁর উপর ঈমান আনে। তবে যারা স্বভাবগত খোদাদ্রোহী ছিল, তারা এসব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের স্বভাবজাত গোম্‌রাহী ও কুফ্‌রীতে লিপ্ত থাকে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে 'বালাগাত' বা ভাষার অলঙ্কার অত্যন্ত উঁচু স্তরে উন্নীত হয়েছিল। আর সে কারণে তারা পরস্পর একজন অন্যজনের উপর 'ফখর' বা গৌরব করতো। এমনকি তারা, তাদের সময়ে রচিত 'সাতটি-কাসীদা'[৮৫] বা গীতিকাব্য কা'বা ঘরের দেওয়ালে সাথে লটকে রেখেছিল; আর এর উদ্দেশ্য ছিল অন্যকে এর অনুরূপ কবিতা রচনার জন্য চ্যালেঞ্জ করা। পূর্ববর্তী ইতিহাস গ্রন্থে এর স্বপক্ষে দলীল বিদ্যমান আছে।

---

[৮৫] একে আরবীতে "সাব'উল-মুআল্লাকা" বা সাতটি ঝুলন্ত গীতি কবিতা বলা হয়। আজও সারা বিশ্বের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে আরবী ভাষার চর্চা হয়, সেখানে এ গ্রন্থটি পাঠ্য পুস্তক হিসেবে পড়ানো হয়। (অনুবাদক)

অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে জিনিস-অর্থাৎ আল্-কোরআন নিয়ে আসলেন, যার মুকাবিলা করতে সমস্ত কবি-সাহিত্যিক অপারগ হলো। যদিও এ ব্যাপারে তারা অনেক ঝগড়া ও মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল, এমনকি তাঁর নুবূওতকেও অস্বীকার করেছিল; ফলে, তাদের মাঝে কেউ কেউ কুফ্রীর উপর মৃত্যুবরণ করেছিল। পক্ষান্তরে, অন্যরা তাঁর নুবূওতের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে মুসলমান হয়েছিল। আর তাদের মাঝে এমন কিছু লোকও ছিল যারা ইসলামকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা সত্ত্বেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় মুসলমান হয়েছিল; যেমন মুনাফিকরা আরো তাদের মাঝে এমন কিছু লোক ছিল, আল্-কোরআনের মুকাবিলা এমন অদ্ভুত ভংগীতে করেছিল, যা দেখলে জ্ঞানীগণের পক্ষে হাস্যসম্বরন করা কঠিন। যেমন তারা এরূপ ভাষার আল্-কোরআনের বিরোধিতা করেছিল :

والزارعات زرعا-فالحا صدات حصدا والطاحنات طحنا والطابخات طبخا فالاكلات اكلا.

এছাড়া তাদের মাঝে এমন একদল ছিল যারা আল্-কোরআনের বিরোধিতার জন্য রক্তপাত ও শোণিত পান করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। এমনকি এজন্যে তারা তাদের অতি প্রিয় জান মাল, সন্তান-সন্ততিকেও ধ্বংস ও হালাকাতের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। অবশেষে এ সত্য বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আল্-কোরআন কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়; বরং তা আল্লাহ সুব্‌হানুহুর তরফ থেকে নাযিল কৃত।

তাদের পঞ্চম অভিযোগ হলো : আল্-কোরআনের শব্দ ও অর্থের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অথচ কোরআনে এরূপ আছে যে :

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

অর্থাৎ "যদি এই কোরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর তরফ থেকে হতো, তবে তারা এতে অনেক মতানৈক্য দেখতে পেতো"।[৮৬]

শব্দগত দিক দিয়ে পার্থক্যের উদারহরণ হলো : كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ[৮৭]এর স্থলে كالصوف المنفوش; فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ[৮৮]এর স্থলে فامضوا الى ذكر الله; فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ[৮৯] এর স্থলে فكانت كالحجارة এবং ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ[৯০] এর স্থলে ضربت عليهم المسكنة والذلة ইত্যাদি।

---

[৮৬] দেখুন সূরা নিসা, ৪; আয়াত : ৮২।

[৮৭] দেখুন, সূরা আল-কারিআ, ১০১; আয়াত : ৫।

[৮৮] দেখুন,সূরা জুমুয়া', ৬২; আয়াত : ৯।

[৮৯] দেখুন, সূরা বাকারা, ২; আয়াত ৭৪।

[৯০] দেখুন সূরা বাকারা, ২; আয়াত : ৬১

আর অর্থের দিক দিয়ে পার্থক্যের উদাহারণ হলো : رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا[৯১] এর স্থলে رَبُّنَا بَاعَدَ بَيْنَ اَسْفَارِنَا প্রথম অংশে بَاعِدْ শব্দটি صيغة امر এবং رب সম্বোধন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে بَاعَدَ শব্দটি صيغة ماضى এবং رب শব্দটি পেশ যুক্ত হওয়ার কারণে অর্থের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রথম অংশটি دعا এবং দ্বিতীয় অংশটি خبرএর অর্থ প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ হলো :هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ [৯২]এর স্থলে, هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ প্রথম অংশে يستطيع শব্দটি صيغة غيب এবং رب শব্দটি পেশ যুক্ত ; যার অর্থ হলো : তোমার রব কি এরূপ করতে সক্ষম? আর দ্বিতীয় অংশে تستطيع শব্দটি صيغة حاضر যার অর্থ হলো : হযরত ঈসা (আ.)-এর অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।

এর জবাব হলো : খবরে আহাদের ভিত্তিতে যা বর্ণিত হয়েছে তা মুরদুদ বা পরিত্যক্ত, আর যা 'খবরে মুতাওয়াতের' এর ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে, তা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বর্ণিত। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন; انزل القران على سبعة احرف অর্থাৎ "আল্-কোরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে, এর প্রত্যেকটি যথেষ্ট এবং পরিপূর্ণ"। সুতরাং জানা গেল যে, আল্-কোরআনের শব্দ ও অর্থের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও তাতে তার ই'জায হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাদের ষষ্ঠ অভিযোগ হলো : আল কোরআনে 'লেহান্' সুর এবং অকারণে শব্দের 'তকরার' বা পুনরুক্তি আছে, যা নেহায়েত অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। লেহানের উদাহারণ হলো :

اِنْ هٰذٰنِ لَسَاحِرَانِ অর্থাৎ "এরা উভয়ই যাদুকর"।[৯৩] আর লাফ্যী তাকরার বা একই শব্দের বার-বার পুনরুক্তির উদাহরণ হলো সূরা রাহমানের এ আয়াতটি; যথা : فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

অর্থাৎ, "হে জিন্ ও ইন্সান' তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার কর?"[৯৪] আর 'মা'নুবী' বা তাৎপর্য পূর্ণ এবং মৌলিক

[৯১] দেখুন সূরা সাবা, ৩৪; আয়াত : ১৯।

[৯২] দেখুন, সূরা মায়েদা, ৫; আয়াত : ১১২।

[৯৩] দেখুন, আল-কোরআন, সূরা ত্বাহা, ২০ আয়াত : ৬৩।

[৯৪] দেখুন সূরা রাহমান, আল্-কোরআন।

পুনরুক্তির উদাহারণ হলো : হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.) এর ঘটনা এগুলো নিহায়েত বাহুল্যতা বৈ-কিছুই নয়, যা পরিত্যজ্য।

১. প্রথমে অভিযোগের জবাব হলো : اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ, এ ব্যাপারে কথিত আছে যে, এটা আল্-কোরআনের যারা 'কাতিব' বা লেখক ছিলেন তাদের ত্রুটি। কেননা, আবু আমর اِنْ هٰذٰيْنِ পড়েছেন, এবং এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, تثنية বা দ্বি-বচন সূচক শব্দের الف অবশিষ্ট রাখা আরব ভাষা-ভাষীদের সাহিত্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন এ কবিতাটিঃ[৯৫] اِنَّ اَبَاهَا وَاَبَا اَبَاهَا-لَقَدْ بَلَغَ فِى الْمَجْدِ غَايَتَاهَا 'আহলে-মদীনা' বা মদীনা বাসী এবং 'আহলে-ইরাক' বা ইরাকের অধিবাসীরা এসব স্থানে এ ভাষাতেই পাঠ করেছেন। আর কেউ-কেউ এরূপও বলেছেন যে এটা কেবল هذا শব্দের জন্য খাস, এখানে ن অক্ষরটি কেবল বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ا অক্ষরটিকে তার স্বীয় অবস্থানে অবশিষ্ট রাখা হয়েছে এবং এখানে কোনরূপ পরিবর্তন করা হয়নি। যেমন الذين শব্দের মধ্যে এরূপ করা হয়েছে যে, সেখানে মূল الذى শব্দের শেষে কেবল ن অক্ষরটি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ى অক্ষরটি তিন অবস্থায় (অর্থাৎ জের যবর পেশে) স্বীয় অবস্থায় অবস্থিত থাকে। আর এটা এজন্য যে, هذا শব্দটির معرب[৯৬] ও مبنى[৯৭] এর 'তাছনীয়া' বা দ্বিবচনের মধ্যে এবং الذى শব্দের معرب ও مبنى এর মাঝে মতানৈক্য আছে। তাছাড়া, এরূপও একটা বক্তব্য আছে যে, এখানে ضميرشان[৯৮] গুপ্ত আছে। যদি ব্যাপারটি সেরূপই হয়ে থাকে, তবে ل অক্ষরটি مبتدا[৯৯] হয়েছে এবং এরূপ হওয়া কোন দোষনীয় ব্যাপার নয় যদিও এরূপ খুব কমই হয়ে থাকে।

২. আর দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব হলো : শব্দের ও মৌলিক পুনরুক্তির মধ্যে অনেক উপকার নিহিত আছে। যথা : (ক) এর দ্বারা বিষয়টি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে, আধিক্যতার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় (খ) এর দ্বারা এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, একই অর্থকে এরূপ বাক্যে প্রকাশ করার শক্তি হাসিল হয় যার ايجاز বা সংক্ষিপ্ত ও اطناب বা দীর্ঘের মধ্যে পার্থক্য আছে; আর এটা বালাগাতের একটি

---

[৯৫] অর্থাৎ সে রমণীর পিতা এবং তার পিতার-পিতা বা পিতামহ, সম্মানের স্বর্ণ-শিখরে আরোহন করেছিল।

[৯৬] معرب আরবী ভাষায় গৃহীত ভিন্ন ভাষার শব্দ।

[৯৭] مبنى মূল আরবী ভাষার শব্দ।

[৯৮] ضمير شان এমন অব্যয় যা নিশ্চিতের সাথে কোন অবস্থা প্রকাশ করে।

[৯৯] উদ্দেশ্যসূচক।

অন্যতম নিয়ম; (গ) একটি কিস্‌সা বা ঘটনা অনেক সময় বহু বিষয়ের সমষ্টিযুক্ত হয়ে থাকে; তাই কোন কোন সময় কিস্‌সাটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য থাকে– বিশেষ কোন ব্যাপার; কিন্তু সেই সাথে অন্যান্য প্রসংগও বর্ণিত হয়। আর কখনো এর বিপরীত অবস্থাও হয়ে থাকে।

এখন অবশিষ্ট রইলো অন্যান্য মু'জিযার প্রসংগ। যেমন : চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়া, জড় পদার্থের কথাবার্তা বলা এবং আন্দোলিত হয়ে নবী কারীম (সা.)-এর নিকট আসা, জীব-জন্তুর কথা-বার্তা বলা, সামান্য খাদ্য দিয়ে বহু লোককে পেট পুরে খাওয়ানো, আঙ্গুলের মাথা দিয়ে পানির ফোয়ারা বের হওয়া, গায়েবের খবর দেওয়া ইত্যাদি। আর এ ধরনের ঘটনা এত বেশী বর্ণিত আছে যে, এ সীমিত পরিসরে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও এসব মু'জিযার সবগুলি বর্ণনার দিক দিয়ে 'মুতাওয়াতির' নয়, তবুও এসব মু'জিযার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতভাবে বর্ণনা পরম্পরার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেমন প্রতিষ্ঠিত হযরত আলী (রা.)-এর বীরত্ব-বাহাদুরী এবং হাতিম তাইয়ের (রহ.) সাখাওত বা দানের ঔদার্যতা। এসব ঘটনা বর্ণনা পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে। কাজেই 'ইছবাতে-নুবূওত' বা নুবূওতের-প্রমাণ প্রসঙ্গে উপরোক্ত আলোচনা আমাদের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করি।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ইছবাতে-নুবূওতের' পক্ষে আরো দলীল, মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের 'আলিম 'জাহিয' এবং আমাদের মধ্যে থেকে ইমাম গায্‌যালী (রা.) যা পছন্দ করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। তাহলো : পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে নুবূওত প্রাপ্তির আগে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবস্থা, দাওয়াত পেশ করাকালীন অবস্থা, তাঁর মহান চরিত্র, বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত এবং এমন স্থানে অকুতোভয় দৃঢ় অবস্থান, যেখানে বড়-বড় বাহাদুররা হতচকিত হয়ে পড়ে এসব গুণাবলী ও কার্যাবলী দ্বারা তাঁর নুবূওতকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে নিঃসন্দেহে দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত বক্তব্যটি ব্যাখ্যাকারে এভাবে পেশ করা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের কোন কাজে এবং দুনিয়ার কোন ব্যাপারে-কোন দিন মিথ্যা বলেননি। যদি তিনি এসব ক্ষেত্রে একবারও মিথ্যার আশ্রয় নিতেন, তবে তার শত্রুরা এ ব্যাপারটি ফলাও করে প্রচার করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্ট চালাতো। তাছাড়া তিনি নুবূওতের আগে এবং নুবূওতের পরে-কোন দিন কোন অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হননি। এছাড়া তিনি ছিলেন বিশিষ্ট বাগ্মী। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন : اتيت جوامع الكلم অর্থাৎ আমাকে সংক্ষেপে অধিক বস্তু পেশের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।[১০০] বস্তুত তিনি ছিলেন 'উম্মী' এবং রিসালাতের দায়িত্ব মানুষের কাছে পৌঁছাতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন

[১০০] হাদীস শরীফ;

ধরনের জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন বরদশ্‌ত করেছিলেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেছিলেন : ما اوذی نبی ما اوذیت অর্থাৎ "আমাকে যেরূপ কষ্ট দেওয়া হয়েছে, পূর্ববর্তী অন্য কোন নবীকে সেরূপ কষ্ট দেওয়া হয়নি"।[১০১] আর এসব বিপদাপদ তিনি দৃঢ়তার সাথে ধৈর্য সহকারে মুকাবিলা করেন।

অবশেষে, যখন তিনি শত্রুদের উপর বিজয়ী হন এবং লোকদের জান ও মালের উপর স্বীয় হুকুম ও আধিপত্য খাটানোর মত অবস্থায় উপনীত হন; তখন তাঁর আগের অবস্থা ও স্বভাবের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত হয়নি, বরং তাঁর পবিত্র জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি এক সুমধুর আখলাক ও চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আর তিনি ছিলেন তাঁর উম্মতের জন্য চরম বন্ধু। যেমন আল্লাহ তা'লার এরশাদ : فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ অর্থাৎ আপনি দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হয়ে নিজের জীবন তাদের জন্য বিনাশ করবেন না।[১০২] فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ اٰثَارِهِمْ অর্থাৎ মনে হয় আপনি তাদের চিন্তায় নিজের জীবনকে হালাক করে দেবেন।[১০৩]

তাছাড়া হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন খুবই দানশীল, সখী। যে কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এর থেকে বিরত থাকার জন্য ধমকের সুরে বলছেন : وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ অর্থাৎ আপনি আপনার হাতকে দানের ক্ষেত্রে অধিক সম্প্রসারিত করবেন না।[১০৪]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি আদৌ কোন আকর্ষণ ছিল না। যেমন কথিত আছে যে, কুরায়েশ সর্দাররা তাঁকে তাঁর দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে এরূপ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, "তোমাকে আমরা আমাদের নেতা বানিয়ে নেব, অনেক ধন-সম্পদ দেব এবং ভোগের জন্য দেব সুন্দরী নারীদের; তুমি তোমার দ্বীন প্রচারের এ খেয়াল পরিহার কর"। কিন্তু তিনি পার্থিব এসব আপাতঃ মধুর ভোগ-বিলাস সামগ্রী ও সম্মানের দিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করেননি; বরং তিনি ফকীর-মিস্‌কীন ও গরীব-অর্থহীনদের অধিক ভালবাসতেন এবং তাদের সাথে অবস্থান করাকে শ্রেয় মনে করতেন। পক্ষান্তরে; তিনি বিত্তবান ও ধনী ব্যক্তিদের সাহচর্য এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন এবং যতদূর সম্ভব তাদের প্রভাব থেকে নিজেকে দূর সরিয়ে রাখতেন।

তাছাড়া, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুশমনদেরকে আদৌ ভয় করতেন না যদিও তা হতো খুবই ভীত শঙ্কুল স্থান

---

[১০১] হাদীস শরীফ।

[১০২] দেখুন, সূরা ফাতির, ৩৫; আয়াত :৮।

[১০৩] দেখুন, সূরা কাহফ্, ১৮; আয়াত : ৬।

[১০৪] দেখুন, সূরা বনী-ঈসরাঈল, ১৭; আয়াত : ২৯।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ ওহোদ ও আহযাবের যুদ্ধের দিনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব ঘটনা তাঁর 'মজবুত দিল্' ও 'বাতিনী কুওত' বা আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বহন করে। যদি আল্লাহ তা'আলার পানাহ ও হিফাযতের উপর তাঁর আস্থা না থাকতো, যেমন আল্লাহর ওয়াদা : وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন,[১০৫] তবে আদৌ তাঁর পক্ষে এরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন সম্ভব হতো না। বিভিন্ন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এরূপ অবস্থানে কোনদিন কোনরূপ ব্যতায় পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও সেখানে বিভিন্নরূপ প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এসব দৃঢ়তা তাঁর নবী সুলভ আচরণের পক্ষে নিঃসন্দেহে মস্তবড় দলীল।

বস্তুত যদি কেউ উল্লেখিত এসব কাজ কর্ম ও বিষয়াদি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করে, তবে সে জানতে পারবে যে, এর প্রত্যেকটি কাজ আলাদা-আলাদাভাবে নুবূওতের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা কোন ব্যক্তির, অন্যান্যদের থেকে বিশেষ কোন কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ায় তিনি যে নবী, তা বুঝা যায় না। কিন্তু উপরে যে সব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কথা আলাচিত হয়েছে তা সম্মিলিতভাবে একমাত্র নবীগণের চরিত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কাজেই, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে উপরোক্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্রে একাধারে সন্নিবেশিত থাকাই তাঁর নবী হওয়ার জন্য সব চাইতে বড় দলীল।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবূওতের স্বপক্ষে ইমাম রাযী (রহ.) যে প্রমাণ পেশ করেছেন, তাও প্রণিধান যোগ্য। যেমন তিনি বলেন : হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন এক কাওমের সামনে তাঁর নুবূওতের দাবী পেশ করেন, যাদের কাছে পূর্ববর্তী কোন আসমানী কিতাব আসেনি, আর তাদের মধ্যে 'হিকমত' বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও ছিল না। বরং তারা ছিল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী; যেমন-আরবের মুশ্‌রিকরা ছিল-মূর্তিপূজক, গোম্‌রাহ; অহেতুক মিথ্যা কথা রটনাকারী-ইয়াহুদী; দুই খোদার ইবাদতকারী এবং যাদের নিকাহ করা হারাম, তাদের বিবাহকারী গোষ্ঠী-মজুস্ বা অগ্নি-উপাসক; এবং তিন খোদার দাবীদার-নাসারারা।

তিনি এদের সামনে তাঁর নুবূওতের দাবী পেশ করে বলেন : আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট কিতাব এবং হিক্‌মতসহ প্রেরিত হয়েছি, যাতে উত্তম চরিত্রের আদর্শ তোমাদের সামনে পেশ করতে পারি। সত্য-আকীদা দ্বারা লোকদের জ্ঞান-শক্তিকে বৃদ্ধি করতে পারি, নেক-আমল দিয়ে তাদের কাজের

[১০৫] দেখুন সূরা মায়েদা, ৫; আয়াত : ৬৭।

শক্তিকে সঞ্জীবিত করতে পারি এবং জ্ঞানীদেরকে ঈমান ও আমলে-সালেহ বা নেক-আমল দিয়ে আলোকিত করতে পারি।

বস্তুত তিনি এরূপই করেন এবং এর দ্বারা স্বীয় দ্বীনকে অন্যান্য দ্বীনের উপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা এর ওয়াদা করেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে, সে সব অসম্পূর্ণ ত্রুটিযুক্ত ধর্মগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবাস্তব ও অসংলগ্ন কথাবার্তা দূরীভূত হয় এবং তাওহীদের সূর্য ও পবিত্রতার চন্দ্র পৃথিবীর আকাশে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর এ-ই হলো নুবূওতের অর্থ।

কেননা, তিনি-ই নবী, যিনি মানুষের মানবতাকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে পৌঁছে দেন এবং তাদের দিলের সে সব গোপন-ব্যাধির চিকিৎসা করেন, যা অধিকাংশ মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। আর শরীরের রোগ ও অসুস্থতা ভাল করার জন্য যেমন শরীর-বিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তারের প্রয়োজন, তেমনি দিল বা আত্মার রোগ নিরাময়ের জন্য এমন একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন, যিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। আর বাস্তব অভিজ্ঞতায় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের দিলের এ ব্যাধি ও যুল্‌মত বা অন্ধকারকে বিদূরিত করার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের প্রভাব ছিল পরিপূর্ণ ও সূদুর প্রসারী। কাজেই, এর দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিলেন সমস্ত নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

উল্লেখ্য যে, 'মাতালিবে-'আলীয়া' গ্রন্থে ইমাম রাযী (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, নুবূওতের হাকীকাত সম্পর্কে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তা সব-ই 'স্পষ্ট দলীল' স্বরূপ। আর আমরা এ-ও বলেছি যে, নুবূওতের মর্যাদা ও যোগ্যতা, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) যা হাসিল করেছিলেন তা অন্য কোন নবী-রাসূলগণের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। কাজেই, তিনি নবী-রাসূলগণের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম।

অপর দিকে, মু'জিযার দ্বারা নুবূওতকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারটি, "নিশ্চিত-দলীল" দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর এ দলীল নুবূওতকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে 'হুকামা' বা জ্ঞানীদের 'তরীকা' বা নিয়ম-নীতির অধিক নিকটবর্তী কেননা, এর মুখ্য উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ হলো : মানুষ তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে এমন এক ব্যক্তির মুখাপেক্ষী, যাকে আল্লাহ তা'আয়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য-সহানুভূতি দেওয়া হয়; আর তিনি তাদের জন্য এমন 'কানুন্' বা বিধান প্রণয়ন করেন, যা তাদের দো-জাহানের মঙ্গল ও কল্যাণে আসে।[১০৬]

---

[১০৬] এ দ্বিতীয় অধ্যায়টি দার্শনিকদের সমালোচনার উদ্দেশ্যে তাদের অপূর্ণ ও অবাস্তব জ্ঞান সম্পর্কে কটাক্ষ করে এবং তাদের রচিত গ্রন্থাদি পাঠে যে ক্ষতি হয়, সেদিকে আলোকপাত করে-লিখিত হয়েছে।